ISSN 0976-9625

Social Science and Humanities

AUREOLE

An Academic Journal

Volume 9 (No. 2)

A Publication on
Social Science and Humanities
2022

BARASAT GOVERNMENT COLLEGE

AUREOLE – An Academic Journal
ISSN : 0976-9625

EDITORIAL BOARD

Chief Editor : **Dr. Samar Chattopadhyay,** WBSES, Principal, Barasat Govt. College

Executive Editor : **Smt. DebashreeDutta,** Assistant Professor, Dept. of Philosophy, Barasat Govt. College **Dr. Ambarish Ray**, Associate Professor, Dept. of Chemistry, Barasat Govt. College**Dr. SrikantaGuria**, Assistant Professor, Dept. of Zoology, Barasat Govt.College

Associate Editors	Advisory Board
Dr. Kisalaya Jana	**Prof. (Dr.) Anjali Mukhopadhyay**
Assistant Professor, Dept. of Bengali	Dept. of Physics, Nuclear physics Division, SINP
Barasat Govt. College	**Prof. (Dr.) Bibhas Bhattacharya**
Dr.Aditi Bhattacharya	Dept. of Physics, West Bengal State University
Assistant Professor, Dept. of Sanskrit	**Prof. (Dr.) Somen Bhattacharya**
Barasat Govt. College	Dept. of Botany, University of Burdwan
Dr. PoulamiSaha	**Prof. (Dr.) ProyashSarkar**
Assistant Professor, Dept. of Sanskrit	Dept. of Philosophy, Jadavpur University
Barasat Govt. College	**Prof. (Dr.) Chiranjib Paul**
Dr. SouramaSaha	Dept. of Zoology, West Bengal State University
Associate Professor, Dept. of Geography	**Dr. Ahana Panda (Assistant Professor)**
Barasat Govt. College	Dept. of History, C. M. C., University of Chicago
Smt. AnamitraChatterjee	**Prof. (Dr.) Prasanta Roy (Emeritus Professor)**
Assistant Professor, Dept. of English	Dept. of Sociology, Presidency University
Barasat Govt. College	**Prof. (Dr.) Niladri R. Chatterjee**
Smt. DolaChattopadhyay	Dept. of English, Kalyani University
Assistant Professor, Dept. of Economics	**Prof. (Dr.) Rajat Banerjee**
Barasat Govt. College	Dept. of Biotechnology, University of Calcutta **Prof. (Dr.) SouvikChattopadhyay** Dept. of Chemistry, Jadavpur University **Prof. (Dr.) DidhitiBiswas** Dept. of Sanskrit, University of Calcutta (Retd.)

AUREOLE

An Academic Journal

Volume 9 (No. 2)

ISSN 0976-9625

A Publication on
Social Science and Humanities
2022

BARASAT GOVERNMENT COLLEGE

Aureile-An Academic Journal (ISSN 0976-9625)
A Publication on Social Science and Humanities

Present Issue :
Volume 9; Number- 2,
Published in December, 2022

Copyright @ Editorial Board of the
ACADEMIC JOURNAL AUREOLE
All Rights Reserved

This issue of the Academic Journal AUREOLE is circulated subject to the condition that any part and / or the whole of the publication will not, by way of trade or otherwise, be copied, lent, hired-out re-circulated in any form without the prior permission of the Editorial Board of the Journal, who publishes this issue on behalf of the publishing authority.

ISSN 0976-9625 of this Journal is assigned by
The National Institute of Science Communication and Information Resources, India

Typeset & Printing :
Swastik Enterprise, Jadavpur, Kolkata - 700 032, Contact : +91 91230 56960

Published in West Bengal, India by the **Principal**
Barasat Government College, Kolkata - 700 124, West Bengal
Phone : (033) 2552 3365; Fax : (033) 2562 5053
e-mail : principal@bgc.org.in

From the Principal & Chief Editor's Desk

Since 2009, Aureole, the peer reviewed academic Journal published by Barasat Government College, has left an indelible mark in the field of intellectual discourses.

One word of explanation is necessary here. In case the number of articles exceeds our limit, a few might have to be put on reserve. However, care should be taken so that those be published in the next issue. The selection of articles is made on strict basis of academic and innovative ideas and is dedicated in the field of humanities.

As a peer reviewed journal, we try our best to keep the standard high. The reviewers, all eminent scholars in their own fields, give thorough consideration to every aspect of the articles under scrutiny. The end result is, we hope, a journal that can stand out in the field of intellectual discourse and development.

Our contributors too have made the necessary rectifications and amendments in their articles at very short notice. A special word of thanks to our editorial team who spent hours completing the necessary work in order to get the journal into shape.

Yours obediently tenders his apology for any mistakes that might have been overlooked. We welcome words of advice and suggestions from our readers, other stakeholders and contributors to accelerate the Journal to a greater academic height.

Barasat

Dr. Samar Chattopadhyay
Principal & Chief Editor
(***West Bengal Senior Education Service***)

Research Article

প্রত্নসাক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুকাল্ট এবং জনপদের সংস্কৃতি

কিশলয় জানা

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বারাসাত গভর্ণমেন্ট কলেজ

ই-মেইল : kisalaya2324@gmail.com

Received: 4th July 2022 Revised: 13th September 2022 Accepted: 22nd September2022

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষে উত্তর-বৈদিক যুগে বিষ্ণুপূজার রীতি ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করে। আদিতে ইন্দ্রের সহচর বিষ্ণু পরবর্তীতে তিন প্রধান পৌরাণিক দেবতার অন্যতম হয়ে ওঠেন। মহাভারত-পরবর্তী যুগে বিষ্ণুর পাশাপাশি কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হিসেবে প্রধান দেবতা হিসেবে পরিগণিত হন। প্রাচীন বঙ্গে যেহেতু অনেক পরবর্তীকালে আর্যায়ন ঘটেছিল, ফলে সেখানে আদিতে বিষ্ণুপূজার রীতি প্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণপূজার রীতি সেদিক থেকে নিতান্ত অর্বাচীন কালের ব্যাপার। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের আগে কৃষ্ণভক্তির কোন নিদর্শন বঙ্গভূমে পাওয়া যায় না। মূলত শৈব ও মাতৃকাপূজায় প্লাবিত বঙ্গদেশে খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দিকে গুপ্ত রাজাদের হাত ধরে হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটে এবং এই সময় থেকেই বঙ্গদেশে বিষ্ণুপূজার সূত্রপাত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নানা উৎখননের ফলে যে বিষ্ণুমূর্তিগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার অধিকাংশর সময়কাল গুপ্ত যুগ থেকে পাল-সেন যুগের অন্তম পর্ব অর্থাৎ একাদশ-দ্বাদশ শতকের কালসীমায়। অনুমান, ওই সময়পর্বে বিষ্ণুপূজার এক সমৃদ্ধ কাল্ট এই বঙ্গভূমে গড়ে উঠেছিল, এবং যা রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার জায়গায় গড়ে ওঠে কৃষ্ণভক্তির ইতিহাস। প্রত্নতাত্ত্বিক সেই সাক্ষ্যগুলির আলোয় পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুকাল্টের স্বরূপকে চিনে নেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

সূচকশব্দ : পৌরাণিক বিষ্ণু, গুপ্তযুগ, বঙ্গদেশে বিষ্ণুপূজন, গুপ্তযুগ ও পৌরাণিক বিষ্ণুমূর্তির উদ্ভব, পাল-সেন যুগ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, রাষ্ট্রিক বিপর্যয়, বেনিয়াতন্ত্র ধ্বংস, কৃষ্ণভজনা।

ভূমিকা

'চৈতন্যভাগবত'কার সেই ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, তৎকালে বঙ্গদেশে—

"ধর্মকর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচন্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।...
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন।।
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী-অভিমানী।
তা সবার মুখেও নাহিক হরিধ্বনি।।
অতিবড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।

গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়।।
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।।
এই মত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্তসব দুঃখ ভাবেন অপার [১]।।"

সেই সময়ের ভারতবর্ষে বিষ্ণুকাল্ট যেখানে বিশেষ বিশেষ বলয়ে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, সেখানে বঙ্গদেশে এই দেবতার প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা অনুমান-প্রমাণের কুয়াশায় আচ্ছন্ন। বিষ্ণুর রূপকল্প আদিতে বৈদিক সংস্কৃতিতে থাকলেও অন্তত ঋগ্বেদে বিষ্ণু প্রধান দেবতা হিসেবে চিহ্নিত হন নি। তবে ইন্দ্রের সখা হিসেবে চিহ্নিত বিষ্ণুর শক্তি ও বিশেষত্বের দিকে ইঙ্গিত করে স্পষ্টই বলা হয়েছে, তিনি বিশ্বজগতের পরিব্রাজক। তিনি রক্ষক, তাঁকে কেউ আঘাত করতে পারে না তিনি ধর্মের ধারক ইত্যাদি [২]। মনে রাখতে হবে, এই বিষ্ণু কিন্তু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পরবর্তীকালের বিষ্ণু, মথুরা-বৃন্দাবনের বংশীধারী কৃষ্ণ নয়। আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক কিংবা মতান্তরে খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যবর্তীকালে রচিত 'বিষ্ণুপুরাণ'-এর অনেক আগেই বিষ্ণুর রূপকল্প যে জনমানসে ব্যাপকতা লাভ করেছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৈদিক বিষ্ণুর রূপকল্প নির্দিষ্ট পুরাণের মধ্যস্থতায় একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল। তবে বিষ্ণু না কি তাঁর অবতার-রূপ কৃষ্ণ—কোন্ দেবতা জনসমাজে অধিক গ্রাহ্য হয়েছিল, সে-বিষয়ে সংশয় থেকেই যায়। কুইন্টাস্ কার্টিয়াস নামে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের একজন গ্রীক ঐতিহাসিকের মতে, আলেক্জাণ্ডার ও পুরুর ঐতিহাসিক যুদ্ধের সময় পুরুর সেনাবাহিনী হেরাক্লিসের (Heracles) মূর্তি সামনে রেখে যুদ্ধ করেছিল [৩]। গ্রীক পুরাণের 'হেরাক্লিস' যিনি দেবতা জিউসের অবৈধ পুত্র, যাঁর কয়েকটি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ভাগবতপুরাণের কৃষ্ণের সাযুজ্য আছে, তাঁর মূর্তি সামনে রেখে পুরুর সেনাবাহিনীর যুদ্ধ করাটা নেহাতই অসম্ভব ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে ভাণ্ডারকর, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা কেউ কেউ মনে করেন, এই 'হেরাক্লিস' আসলে বাসুদেব-কৃষ্ণ [৪]। 'বিষ্ণুপুরাণে'র গোড়াতেই বিষ্ণুস্তুতিতে বলা হয়েছে,

"অবিকারায় শুদ্ধায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
সদৈকরূপরূপায় বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে।।
নমো হিরণ্যগর্ভায় হরয়ে শঙ্করায় চ।
বাসুদেবায় তারায় সর্গ স্থিত্যন্তকারিণে [৫]।।"

এখানে কিন্তু "বাসুদেব" বলতে কৃষ্ণকে নয়, 'বিষ্ণু'র স্বীয় রূপকেই বোঝানো হয়েছে। অতএব, পুরুর সেনাবাহিনী কর্তৃক কৃষ্ণমূর্তি যেমন গ্রহণ করা সম্ভব, তেমনই বিষ্ণুমূর্তি গ্রহণ করাও নিতান্ত অসম্ভব নয়। কারণ, বিষ্ণুপুরাণের প্রাগুক্ত স্তোত্রে বিষ্ণুকে সকল কিছুর রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা বলা হয়েছে [৬]। অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি পুরুর সেনাবাহিনীর রক্ষক হিসেবে অগ্রভাগে থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেই। সম্ভবত 'মহাভারত' অনুসরণে অর্জুনের সারথী হিসাবে কৃষ্ণ-বাসুদেবের সম্মুখভাগে থাকার সাদৃশ্যে একালের সমালোচকেরা অনুমান করে নিয়েছেন যে, গ্রীক ঐতিহাসিকেরা যে হেরাক্লিসের মূর্তির কথা বলছেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার-রূপ কৃষ্ণই, স্বয়ং বিষ্ণু নয়। কেউ কেউ অনুমান করেন, বিষ্ণুর 'ত্রিপদ তত্ত্ব' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আদিতে ইন্দ্র, সূর্য এবং বিষ্ণু পৃথক পৃথক রূপে কথিত হলেও, কালান্তরে এই তিন দেবতাই একত্ব প্রাপ্ত হন। 'সামবেদে' বলা হয়েছে— "ইন্দ্রো মহ্না রোদসী পপ্রথচ্ছব ইন্দ্রঃ সূর্যমরোচয়েৎ। ইন্দ্রে হ বিশ্বা ভুবনানি যেমির ইন্দ্রে স্বানাস ইন্দবঃ"[৭], অর্থাৎ এখানে ইন্দ্রের দ্বারাই সূর্য আলোকিত অপিচ ইন্দ্রই সূর্য এবং বিশ্বভুবনের সার, যাঁর মধ্যেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নিত্য আবর্তিত হয়। এই বয়ানের সঙ্গে পরবর্তীকালের 'বিষ্ণুপুরাণে'র ভাষ্যের যে অনেকখানি মিল, তা বোঝা যায়। সূর্য এবং বিষ্ণু যে আসলে সমার্থক, 'রামায়ণে'র শ্লোক থেকেও তা সমর্থিত হয়। 'কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে' বলা হয়েছে,

"তত্র পূবপদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণু স্ত্রিবিক্রমো
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ।
উত্তরেণ পরিক্রম্য জম্বুদ্বীপং দিবাকরঃ
দৃশ্যো ভবতি ভূয়িষ্ঠং শিখরং তন্মহোচ্ছ্রয়ম্ [৮]।।"

বোঝা যায়, প্রাথমিক বৈদিক যুগ থেকে রামায়ণের কালে এসে বিষ্ণু গ্রাস করেছিলেন সূর্য এবং ইন্দ্রের সমস্ত গুণাবলী এবং হয়ে উঠেছিলেন তিন প্রধান দেবতার অন্যতম।

আলোচনা

ভারতবর্ষে বিষ্ণুপূজার সূচনা কবে এবং কাদের হাত ধরে হয়, তা পৃথকভাবে বলা শক্ত। একই ভাবে বলা শক্ত যে, এই বৈদিক দেবতা কী ভাবে অনার্য দ্রাবিড় সভ্যতায় "স্বামী"-যোগে নানা রূপে জাঁকিয়ে বসলেন। তবে মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণের সাক্ষ্য অনুযায়ী [৯] কেউ কেউ অনুমান করেন যে, মথুরা অঞ্চলের 'সৌরসেনী' নামক জাতির মানুষদের মধ্যে কৃষ্ণ-বাসুদেবের পূজার প্রচলন ঘটে [১০]। যদিও মেগাস্থিনিস 'কৃষ্ণ' শব্দটি আদৌ উল্লেখ করেন নি, তবে মথুরা, কৃষ্ণপুর, যমুনা ইত্যাদির নামসাদৃশ্যে তাঁদের কারুর কারুর অনুমান, বাসুদেব-কৃষ্ণের পূজার সূত্র ধরেই এদেশে বিষ্ণুপূজার সূচনা ঘটে।

এই বাংলায় বিষ্ণুপূজার প্রচলন কবে ঘটে, সে-বিষয়েও মতের অন্ত নেই। তবে, নানা কারণে অনুমান করা হয়, গুপ্ত যুগেই এই সংস্কৃতি বঙ্গদেশে প্রবেশ করে [১১]। ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘকাল ধরে যে-সব সাম্রাজ্য প্রায় নিরঙ্কুশ রাজত্ব চালিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে গুপ্ত সাম্রাজ্য অন্যতম। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের অধিকার ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের আমল থেকেই বিষ্ণুপূজনের রীতি-পদ্ধতি ক্রমশ প্রসার লাভ করে। স্টেলা কামরিশের মতে, অতীতে উত্তরপশ্চিমের গান্ধার থেকে পূর্বভাগের পুণ্ড্রবর্দ্ধন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে দেবতা হিসেবে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা লাভ করেন [১২]। যদিও পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, যদুকুলকেশরী কৃষ্ণের হাত ধরেই বিষ্ণু-উপাসনার সূত্রপাত হয়, কিন্তু এই মত কতখানি যথার্থ, সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগে। অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গ্রীকরাজা অ্যান্টিঅ্যালকিডাসের দূত হেলিয়োডোরাস প্রাচীন বিদিশা তথা মধ্যভারতের বেশনগরে একটি গড়ুর-স্তম্ভ স্থাপন করে বাসুদেবের প্রতি তাঁর মনের ভক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করেন। যদি সে-সময় বাসুদেব-কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত থাকত, তাহলে গড়ুরস্তম্ভ স্থাপন না করে কৃষ্ণের গাভী কিংবা অন্য কিছুর প্রতীক-অঙ্কিত স্তম্ভ স্থাপনই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু গড়ুর একান্তভাবেই বিষ্ণুকথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বেদে বিষ্ণুকে 'গরুত্মান্' অর্থাৎ পাখির মতো গতিশীল বলা হয়েছে, সেই থেকেই বিষ্ণুর পুরাণকথিত গড়ুর বাহনের উদ্ভব বলে কেউ কেউ মনে করেন [১৩]। বিদিশায় প্রাপ্ত গড়ুরমূর্তি প্রমাণ করে যে, তখনও ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্রগুলিতে দেবতা হিসেবে বংশীধারী গোপবল্লভ কৃষ্ণের তেমন প্রসার ঘটে নি। তা ঘটলে এই সময়কালের একাধিক কৃষ্ণমূর্তি পাওয়া সম্ভব হত। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে কৃষ্ণমিথ তখনও জনমানসে উপাদেয় বলে বিবেচিত হয় নি, কিন্তু বিষ্ণুমিথ প্রবলভাবে সমাদৃত। সেই কারণেই মধ্যপ্রদেশের ভারহুতের বৌদ্ধস্তূপে প্রাপ্ত অশ্বারোহীর হাতে গরুড়ধ্বজের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেকালে যুদ্ধ ইত্যাদিতে গরুড়ধ্বজ সামনে রেখে যুদ্ধ করার রেওয়াজ ছিল। কর্টিয়াস তাঁর লেখায় হেরাক্লিসের মূর্তি বলতে কি এই গড়ুরধ্বজের কথা বুঝিয়েছেন ? যদি বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে, বিষয়টি বাস্তবতা পায়। উল্লেখযোগ্য যে, কুষাণ যুগে কনিষ্কের মুদ্রায় অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এই সময়ে অর্থাৎ ৭৮ থেকে ১০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে

বিষ্ণু যথেষ্ট প্রভাবশালী দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, সেই প্রতিষ্ঠা কৃষ্ণ-বাসুদেব তখনও অর্জন করতে পারেন নি।

গুপ্ত সাম্রাজ্য অন্তত চতুর্থ শতকের দিকে এই বাংলাতেও নিজেদের অধিকার কায়েম করতে পেরেছিল এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমতট বাদে বাকি অংশ ছিল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে সমুদ্রগুপ্তের সময় অবশ্য সমতটও এই সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে [১৪]। বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে'র সাক্ষ্য থেকে কেউ কেউ মনে করে থাকেন, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সূত্রপাত এই বাংলা থেকেই ঘটেছিল [১৫]। কিন্তু 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'কে বাস্তব ঐতিহাসিক তথ্যের আকর ভাবলে ভুল হবে, এর বয়ান অনেকাংশেই বাংলার প্রচলিত লোকগাথা এবং রচনাকারের কল্পনার সংমিশ্রণ বলা চলে। তবে, যে-সময়েই গুপ্ত বংশের সূচনা এবং এই বাংলার বুকে সার্বিক ক্ষমতায়ন ঘটুক না কেন, এই সময় থেকেই যে বিষ্ণুপূজন এবং তাঁর মূর্তি নির্মাণের সুত্রপাত ঘটেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এর কারণ, এই বঙ্গের অধিকাংশ স্থানে, যেখানে যেখানে প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির বেশিরভাগের কাল-বিচার করে দেখা গিয়েছে, তা গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগের মধ্যবর্তী সময়ের নির্মাণ। আশ্চর্যের বিষয় এই, একদিন এই বঙ্গে চৈতন্যোত্তর কালে যে 'কৃষ্ণভজন' হয়ে উঠেছিল যথাসর্বস্ব, তাঁকে কিন্তু প্রাচীন ভাস্কর্যে খুঁজে পাওয়া গেল না বললেই চলে। তার কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকেরা একমত যে, সুপ্রাচীন বঙ্গে বৈষ্ণবতা সাধারণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও, কৃষ্ণপূজা ততটা ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি [১৬]। এর কারণ সম্ভবত কৃষ্ণ-মিথের মধ্যেই পাওয়া যায়। বংশীধারী কৃষ্ণ ও রাধার যে রূপকল্পটি পরবর্তীকালে এই বঙ্গে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, তার উপজীব্য ছিল মধুর রস। লোকায়ত জীবনে এই কাহিনি সুপ্রচলিত থাকলেও কৃষ্ণ তখনও এই পোড়া দেশে দেবত্বে উন্নীত হন নি। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যই তার প্রমাণ। কৃষ্ণ-চরিত্রের স্বভাব-কোমলতা রাজা কিংবা রাজন্যবর্গ কারুরই মনঃপূত হয় নি। তাছাড়া গুপ্ত-অধিকৃত বঙ্গে 'বিষ্ণু'র প্রভাব বেড়ে ওঠা আশ্চর্য কিছু নয়, কারণ বিষ্ণু ছিলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রধান দেবতা। এই বংশের প্রায় সকলেই মূলত বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং এর সমর্থন মেলে তাঁদের আমলে প্রচলিত প্রত্নলেখ কিংবা মুদ্রা থেকে [১৭]। প্রাপ্ত মুদ্রাগুলির অধিকাংশতেই লক্ষ্মী এবং বিষ্ণুবাহন গড়ুরের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে পরবর্তীকালের প্রত্নলেখগুলির অনেকগুলিতেই বৈষ্ণবীয় ভাবধারার সন্ধান মেলে। এই রূপের পরিবর্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুই তাঁদের সাম্রাজ্যকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবেন—এই বিশ্বাসে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে সঙ্গে 'বিষ্ণু' হয়ে ওঠেন প্রাথমিক ক্ষেত্রে তাঁদের আরাধ্য। সেই কারণেই কৃষ্ণের তুলনায় বিষ্ণুর সুপ্রাচীন মূর্তিই এই বাংলায় বেশি পাওয়া গিয়েছে। বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "খ্রিস্টীয় বারো শতক নাগাদ জৈনধর্মের লোপ ও ষোল-সতেরো শতক নাগাদ শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তির বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠার মাঝখানের চার-পাঁচ শতাব্দীকাল এ এলাকার হিন্দুরা যে প্রধানতঃ শিব, বিষ্ণু (বাসুদেব) ও শক্তির আরাধনাই করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।... চৈতন্যপরবর্তীকালে, বাসুদেবভক্তির প্রাচীনতর ধারাটি ধীরে ধীরে শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত রাধাকৃষ্ণের লীলামূর্তির উপাসনায় রূপান্তরিত হতে শুরু করে।" [১৮] কিন্তু আমাদের অনুমান, বারো শতকের অনেক আগে থেকেই এই বাংলায় বিষ্ণুর নানা রূপের পূজার প্রচলন ঘটে। তার কারণ, এপার ও ওপার বাংলার কোন কোন অঞ্চলে গুপ্তযুগে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। একটি-দুটি নয়, যথেষ্ট পরিমাণে। নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থলে উৎখননে সংখ্যাটি যে আরও বাড়বে, সন্দেহ নেই। সাধারণভাবে যদিও পাল - সেন যুগে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি সংখ্যায় বেশি পাওয়া গিয়েছে কোন কোন অঞ্চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে নির্মিত এবং প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যা হাতে গোণা, কয়েকটি মাত্র।

তবে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে রাতারাতি চৈতন্যদেবের প্রভাবে কৃষ্ণকাল্ট বাঙালি লৌকিক সমাজ গ্রহণ করে তার মূর্তি নির্মাণ শুরু করে দিল, এমন ভাবাটা ভুল। বরং মনে করা সঙ্গত যে, বৈদিক-বিষ্ণু বা বাসুদেবের সমান্তরালে লৌকিক জীবনে বৃন্দাবনবিলাসী কৃষ্ণের কথাও এরও আগে থেকেই নিশ্চয়ই সুপরিচিত ছিল, তা না হলে রাখালিয়া কবি বড়ু চণ্ডীদাস রাধা-কৃষ্ণ-বড়াইকে নিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক নাট-গীতি-পাঞ্চালি লিখতে পারতেন না। যতই জয়দেবের 'গীতগোবিন্দমের' অনুষঙ্গ থাক, এই কাব্যের কাহিনি-গ্রন্থন ও চরিত্র-চিত্রণে লোকায়ত জীবনের প্রভাব উপেক্ষা করার নয়। রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ যে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর আগেই অভিজাত জনসমাজের মুখরোচক আস্বাদনের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ'। ঐতিহাসিকের অনুমান, ভারতের সামাজিক জীবনে "ফিউডাল" ব্যবস্থা যতই পাকাপোক্তভাবে কায়েম হল, ততই বৈদিক ব্রাহ্মণ্যতার সঙ্গে অবৈদিক ধর্মবিশ্বাসের সংঘাতের পথ তৈরি হল এবং তারই ফলশ্রুতিতে, নতুন সাংস্কৃতিক পটভূমিতে "দৈত্যনিসূদন 'চক্রস্বামী' বিষ্ণুর চেয়ে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের বেশি জনপ্রিয়তা" দেখা দিল, [১৯] যার দরুণ জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' রচনা অনিবার্য ছিল। শাসকশ্রেণিও নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি-রুচি অনুযায়ী এই 'সহজ' রসের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠতে দ্বিধা করেন নি [২০]। ফলে লৌকিক প্রেমগাথাও ঢুকে পড়ল সাহিত্যের আঙিনায়। তবে লোকায়ত সমাজেও কোনভাবে এই কাহিনি প্রসার লাভ করেছিল, তা অনুমান করা যায়। সম্ভবত সেন রাজাদের কিছু অবদান এর পিছনে থাকতে পারে। তবে প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বড়ু চণ্ডীদাস থেকে মালাধর বসু পর্যন্ত সময়কালে কৃষ্ণকথা যে বাঙালির প্রাণের কথা হয়ে উঠেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তা না হলে বাঙালির সাহিত্য ক্রমশ কৃষ্ণময় হয়ে উঠতে পারত না। জগতের রক্ষাকারী বিষ্ণুর তুলনায় বংশীধারী কৃষ্ণের জনপ্রিয় হয়ে ওঠা বাঙালির স্বভাবগুণেই অনিবার্য ছিল। তার মূলে আছে, বাঙালির চিরাচরিত স্বভাব। বাঙালি নরম-কোমল-ভীরু, বাস্তবের চেয়ে স্বপ্নজগতে বিচরণ করাই তার চারিত্র-ধর্ম, সর্বোপরি সে প্রেমিক। তাছাড়া বাল্যলীলা থেকে যৌবনলীলার মধ্যে দিয়ে বংশীধারী কৃষ্ণ অনেকটাই আমাদের পারিবারিক দেবতা হয়ে উঠেছিলেন। বিষ্ণুর উপস্থিতি উত্তরকালে সীমাবদ্ধ ছিল শালগ্রাম শীলার মধ্যে। হুতোম বলেছেন, সেকালে প্রায় সকলের বাড়িতেই শালগ্রাম শীলা আর লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখা কয়েকখানি মোহর থাকত [২১]। এই বাংলায় পৌঁছে বৈদিক দেবতা বিষ্ণু সব হারিয়ে শেষে শালগ্রাম শীলাতে পরিণত হয়েছিলেন, এটাই ঐতিহাসিক সত্য। মনে রাখতে হবে যে, মালাধর বসুর কাব্যে প্রেমিক-রূপের চেয়ে কৃষ্ণের কংসবধকারী শ্রীমধুসূদন রূপটিই অধিক মর্যাদায় উপস্থাপিত হয়েছে। তা অভিনব ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু মালাধর বসুর কাব্য যে চৈতন্যের সার্টিফিকেট সত্ত্বেও উত্তরকালে ব্যাপকতর পাঠকসমাজের কাছেই উপেক্ষিত হল, তার কারণ, বাঙালি অন্য রূপে কৃষ্ণ-বাসুদেবকে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, ফলে মালাধর বসুর কাব্যটি ব্যতিক্রমী হওয়া সত্ত্বেও জনমানসের মন থেকে সুদীর্ঘ সময়কালের জন্য একেবারে মুছে গেল।

একদিন এই বাংলায় যে এক সমৃদ্ধ বিষ্ণুকাল্ট ছিল, সে-বিষয়ে আজ আর দ্বিমতের অবকাশ নেই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাল ও সেন যুগের, তার পূর্ববর্তী গুপ্তযুগে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি সারা বাংলাতেই নানা জায়গায় পাওয়া গেছে, সংখ্যার দিক থেকেও তা নগণ্য নয়। পাশাপাশি, সম্পূর্ণ কিংবা নানা কারণে পরিত্যক্ত বিষ্ণু-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ সেই সত্যের ইঙ্গিত বহন করে যে, এককালে বিষ্ণুর উপাসনা বহুল প্রচলিত ছিল। যদিও এ-বিষোয়ে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আরও অনেক বেশি যত্নবান এবং সক্রিয় হওয়া উচিৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলগুলির উৎখননের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ, তা না হলে বাংলার বিষ্ণুকাল্টের সমৃদ্ধ ইতিহাসের অনেকটাই অজানা থেকে যাবে। এখনও পর্যন্ত যা উৎখননের ফলে পাওয়া গিয়েছে, তার সামগ্রিক

একটি খতিয়ান যদি নেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলিতে প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তির সম্পূর্ণ কিংবা ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে নিম্নরূপ ভাবে—

সারণী- ১

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যাবাচক তালিকা

জেলা	মূর্তির সংখ্যা	সময়কাল	মন্দিরের সংখ্যা	সময়কাল
জলপাইগুড়ি	৭	১০ম থেকে ১২শ শতক	১	১১শ থেকে ১২শ
কোচবিহার	২	পাল-যুগের শেষভাগ	-	-
মালদা	৪	একাদশ-দ্বাদশ শতক	-	-
মুর্শিদাবাদ	৩	একাদশ থেকে ত্রয়োদশ	-	-
বাঁকুড়া	১১	আনুমানিক পাল-সেন যুগ থেকে ষোড়শ	৪	আনুমানিক একাদশ থেকে ষোড়শ
বীরভূম	১০	আনুমানিক একাদশ থেকে দ্বাদশ	৪	আনুমানিক একাদশ থেকে দ্বাদশ
নদীয়া	-	-	-	-
হাওড়া	২৫	পাল সেন যুগ থেকে ত্রয়োদশ শতক	-	-
হুগলী	২০	ষষ্ঠ শতক থেকে একাদশ শতক	১	-
পূর্ব মেদিনীপুর	-	-	-	-
পশ্চিম মেদিনীপুর	-	-	-	-
উত্তর চব্বিশ পরগণা	৪	পাল-সেন যুগ থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ	-	-
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা	৮৫	গুপ্ত যুগ থেকে পাল-সেন যুগ, ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত	-	-
অন্যান্য	৫	পাল-সেন যুগ থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ	-	-
মোট সংখ্যা	~১৭৬		~১০	

এই সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে, এ-পার বাংলায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়, এর পর হাওড়া জেলার স্থান। তৃতীয় স্থানে আছে হুগলী। হুগলীতে আরও বেশি সংখ্যাক বিষ্ণুমূর্তি আছে বলে অনুমিত হয়, যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলেই প্রকৃত চেহারা উঠে আসতে পারে। আজ বীরভূমে শাক্ত প্রভাব বেশি থাকলেও সুদূর অতীতে এই অঞ্চলেও বৈষ্ণবতার প্রাচুর্য ছিল। আবার জলপাইগুড়ি এলাকা একেবারে বাংলার পূর্ব প্রান্তে হলেও, সেখানেও আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। অন্যদিকে বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায় নি মুর্শিদাবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণায়। না-পাওয়ার অর্থ এই নয় যে, এই সমস্ত অঞ্চলে বিষ্ণুপূজার প্রচলন একেবারেই ছিল না। প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করা হলে এই সমস্ত অঞ্চলেও মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়। তাছাড়া যদি অতীত বঙ্গদেশের সম্পূর্ণ খতিয়ান নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, রাজনৈতিক কারণে বিভাজিত এই অঞ্চলেই কেবল নয়, ওপার বাংলাতেও বিক্রমপুর, পাহাড়পুর ইত্যাদি নানা জায়গায় বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এর থেকে অনুমান করে নেওয়া অসম্ভব নয় যে, সেকালে সম্পূর্ণ বঙ্গদেশেই বিষ্ণুপূজনের রীতি জনপ্রিয় ছিল।

কেবল মূর্তিসাক্ষ্য থেকেই নয়, প্রাচীন তাম্র ও শিলালেখ থেকেও অনুমান করা চলে যে, উভয় বঙ্গেই বিষ্ণুপূজার ব্যাপকতা ছিল এবং লৌকিক নাম ইত্যাদিতেও জনসাধারণ 'বিষ্ণু'কে গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। মুখোপাধ্যায় ও মাইতির সমীক্ষা অনুসরণ করলে দেখা যায়, অন্তত পঁয়ত্রিশটি তাম্র ও প্রস্তরলেখতে বিষ্ণু ও তাঁর নানা অনুষঙ্গের উল্লেখে আছে [২২]। এই সমস্ত তাম্র, প্রস্তর, মূর্তি প্রভৃতি লেখগুলি খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের এবং এগুলি পাওয়া গিয়েছে সামগ্রিকভাবে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, যেমন— বাঁকুড়া, দিনাজপুর, বর্ধমান, মালদহ, ঢাকা, বিক্রমপুর, বগুড়া, রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চলে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি বাংলার ইতিহাস রচনার নির্ভরযোগ্য উপকরণ হিসেবে বিখ্যাত [২৩]।

নানা স্থান থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিগুলি যে সবকটিই চতুর্ভুজ—এমনটি নয়। বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণে শিল্পীরা পুরাণোক্ত নানা রূপকেই গ্রহণ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদের মতে [২৪], পুরাণোক্ত বিষ্ণুমূর্তিগুলি চার প্রকার ; যথা—

ক. চতুর্ব্বিংশতিমূর্তি : কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষিকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র, জনার্দ্দন, হরি ও কৃষ্ণ।

খ. চতুর্মূর্তি : বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

গ. বিশেষ মূর্তি : উপর্যুক্ত দুই প্রকার মূর্তি ভিন্ন অন্য নামের মূর্তি।

ঘ. সাধারণ মূর্তি : বিশেষ কোন নাম নেই, প্রথম তিন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথচ যা বিষ্ণুমূর্তি হিসেবে কথিত।

তবে, প্রথম দুটি মূর্তিরূপ পুরাণে যেমনটি বলা আছে, প্রায়শই তা মূর্তি নির্মাণের সময় শিল্পী যে মেনে চলেন না, সে-কথাও বিদ্যাবিনোদ জানিয়েছেন। প্রথমোক্ত মূর্তিগুলির পার্থক্য করা হয়, মূর্তির হাতে রাখা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মের অবস্থানভেদের দিক দিয়ে। বিদ্যাবিনোদ এই অবস্থানভেদের যে তালিকা দিয়েছেন [২৫], তা এইরকম—

সারণী- ২

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	উপরের ডান হাত	নিচের ডান হাত	উপরের বাম হাত	নিচের বাম হাত
১	কেশব	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
২	নারায়ণ	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৩	মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৪	গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৫	বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৬	মধুসূদন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
৭	ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
৮	বামন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
৯	শ্রীধর মতান্তরে :	পদ্ম পদ্ম	চক্র চক্র	শাঙ্গর্ধনু গদা	শঙ্খ শঙ্খ
১০	হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
১১	পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
১২	দামোদর	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১৩	বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
১৪	সংকর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
১৫	প্রদ্যুম্ন	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
১৬	অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১৭	পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
১৮	অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
১৯	নৃসিংহ	চক্র	পদ্ম	গদা	শঙ্খ
২০	অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ
২১	উপেন্দ্র	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
২২	জনার্দ্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
২৩	হরি	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
২৪	কৃষ্ণ	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র

মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পীকে সচেতন থাকতে হত, বিষ্ণুর কোন্ রূপের মূর্তি তিনি নির্মাণ করছেন, তাঁর নির্দিষ্ট রূপকল্পটি আগে ঠিক করে জেনে তারপর নির্মাণকাজে হাত দেওয়া হত। ভারতীয় মূর্তিনির্মাণে বিষ্ণুর মতো এত বিচিত্র বিভাগ আর কোন দেবদেবীর নেই। এই তালিকার 'উপেন্দ্র' বিষ্ণুর বালকরূপ, ফলে এই মূর্তিনির্মাণে শিল্পীকে বালভাব ফুটিয়ে তোলার দিকে সচেতন থাকতে হত। তালিকার 'কৃষ্ণ'-ও আমাদের

বৈষ্ণব-পদাবলীর কৃষ্ণ নয়, ইনি আদতে বিষ্ণুই। এই তালিকা থেকে আর একটি বিষয়ো স্পষ্ট হয় যে, প্রাপ্ত মূর্তিগুলির রূপগত বিভাগ করা সবসময় সহজ নয়। মধুসূদন ও বামন রূপের ক্ষেত্রে হস্তধৃত সামগ্রীর অবস্থান এক হলেও মূলত উচ্চতার দিক থেকে বামন মূর্তি যেহেতু খর্বাকৃতি আকারে গড়া হয়, অতএব বিভ্রান্তির অবকাশ কম। তবে, হাতের ক্ষেত্রে অনেকসময়েই নিয়ম মেনে চলেন নি শিল্পীরা। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া থানার উত্তর-পশ্চিমে বিহারীনাথ পাহাড়ে আধুনিককালে সংস্কারপ্রাপ্ত নতুন মন্দিরে যে বড় পাথরের লোকেশ্বর-বিষ্ণুমূর্তি আছে, তাঁর হাতের সংখ্যা বারোটি। মূর্তির সুডৌল গঠন দেখে এটি গুপ্ত যুগে নির্মিত বলে মনে করা চলে। একাধিক আয়ূধের সঙ্গে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মও হাতে আছে মূর্তিটির। নিচে দুপাশে লক্ষী-সরস্বতী এবং তারও নিচে পাদপীঠে বামন প্রভৃতির মূর্তি। এক্ষেত্রে তাঁদের স্বাধীনতা শিল্পের দিক থেকেই বিচার্য। এই মূর্তি নির্মাণ তখনকার, যখন বিষ্ণু স্বর্গীয় মহামহিম দেবতা হিসেবেই গণ্য, ফলে অতি-লৌকিক বোঝাতে তাঁর মূর্তিতে অধিক সংখ্যক হাত যোজনা করেছেন শিল্পী। রাষ্ট্রিক বিপন্নতার বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি মনোভাব সঞ্চার করাও হয়তো শিল্পীর এই প্রকার রূপধ্যানের মধ্যে নিহিত ছিল।

বলা বাহুল্য, এর সবকটি রূপই বিচ্ছিন্নভাবে সারা দেশে পাওয়া গেলেও, পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি সামান্য রূপভেদই অনুসরণ করেছে। এখানে প্রাপ্ত মূর্তিগুলির মধ্যে বিষ্ণুমূর্তিই প্রধান। বিষ্ণুর মূর্তিগুলি প্রধানত তিনটি ভঙ্গিমায় নির্মিত; যথা— সম্পূর্ণ দণ্ডায়মান, পদ্মাসনে উপবিষ্ট (এই মুদ্রার ভঙ্গিতে বৌদ্ধ কিংবা জৈন ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়) এবং অনন্তশায়ী। বিষ্ণুর অন্যান্য যে রূপগুলি প্রাপ্ত মূর্তির তালিকায় আছে, তার মধ্যে কিছু মূর্তি বাসুদেবের। দিনাজপুরে একটি নৃসিংহ মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, বরাহমূর্তি পাওয়া গিয়েছে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান এবং বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়ার গোকুলনগরে গোকুলনগর মন্দিরের কাছেই ক্লোরাইট পাথরে তৈরি বামনাবতারের মূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। এত বড় বামনাবতারের মূর্তি পশ্চিমবঙ্গে আর নেই। একইস্থান থেকে পাওয়া কালো পাথরের তৈরি বৃহৎ অনন্তবিষ্ণু মূর্তিটি এই জেলার বৃহত্তর মূর্তি, রাখা আছে বিষ্ণুপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে সাহিত্য-পরিষৎ-এর বিষ্ণুপুর শাখার মিউজিয়ামে। অবিভক্ত বঙ্গদেশে বামন মূর্তির প্রায় সবকটিই পাওয়া গিয়েছে ঢাকা জেলায়। সেখানে নৃসিংহ মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গাতেই বরাহমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মূল বিষ্ণুমূর্তিটি কেন্দ্রভাগে রেখে, তার পৃষ্ঠপীঠে বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার যেমন, কূর্ম, বামন, নৃসিংহ ইত্যাদি খোদাই করারও প্রবণতা দেখা যায়। যেমন, জলপাইগুড়ি জেলার বিখ্যাত জল্পেশ মন্দিরের কাছে দিঘি থেকে পাওয়া বিষ্ণুপট্টে একদিকে রয়েছেন পদ্মাসনে উপবিষ্ট বিষ্ণু, তাঁর দুপাশে রয়েছেন দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী, অন্য পিঠে গোলাকার প্রস্ফুটিত পদ্মের প্রতিটিতে বিষ্ণুর দশাবতার রূপ [২৬]। আবার, হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার নিজবালিয়ায় দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরে কাঠের দেবীমুর্তির বাঁ-পাশে একটি তিন ফিট উঁচু কালো কষ্টিপাথরের বাসুদেবমূর্তি রয়েছে [২৭], যাঁর পৃষ্ঠপটে কীর্তিমুখ এবং তার নীচে ডান দিকে রিলিফে নৃসিংহ, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ ও বলী এবং বাঁদিকে বলরাম, রামচন্দ্র, পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কির মূর্তি। তারও নীচে ডান দিকে সরস্বতী, বাঁদিকে লক্ষ্মী এবং পদতলে জোর হাতে গড়ূর। একাদশ শতকে নির্মিত এইরকম সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকাজসম্পন্ন বাসুদেবমূর্তি পশিমবঙ্গে বিরল। মূর্তিটির শিল্পী বাঙালি হলে এবং মূর্তিটি বঙ্গদেশেই নির্মিত হলে একাদশ শতকে বাঙালির ভাস্কর্যবোধ যে শ্লাঘার বস্তু ছিল, সন্দেহ নেই। দেখা যায়, সচরাচর বিষ্ণুমূর্তিকে এককভাবে উপস্থিত না করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্মী-সরস্বতীসহ নির্মাণ করা হত। জলপাইগুড়ি জেলারই জোড়পোকরি গ্রাম থেকে সংগৃহীত আনুমানিক দ্বাদশ শতকে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তিটির দু' -পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উপস্থিত। দেবতার সঙ্গে তাঁর পত্নীদের উপস্থিত করার মধ্যে দিয়ে, দেবতাদের মানবায়িত করে কাছাকাছি টেনে আনার একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। একইসঙ্গে বহুপত্নীক বাংলার সামাজিক বীক্ষ্যাও ধরা পড়ে।

তবে, মূলত বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যাধিক্য থেকে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, বিষ্ণুর অন্যান্য রূপকল্পের কথা জানা থাকলেও, বিষ্ণু স্বয়ং এই বঙ্গে জনপ্রিয় ছিলেন, ফলে তাঁর মূর্তিই বেশি পরিমাণে নির্মিত হয়েছে।

সাধারণভাবে, বিষ্ণুর দণ্ডায়মান মূর্তি বেশি পাওয়া গিয়েছে। এগুলি নির্মাণে ভারতীয় মূর্তি নির্মাণের প্রথাই অনুসৃত দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণে এই যে একটি নির্দিষ্ট স্কুল গড়ে উঠেছিল সে-সময়ের ভারতে, বাঙালি শিল্পীদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। একইসঙ্গে এঁদের কেউ বা কেউ কেউ কি হাতে-কলমে শিক্ষা করে তবেই মূর্তি নির্মাণে হাত দিয়েছিলেন? তা না হলে, ভাস্কর্যে সমরূপময়তার অন্য কারণ থাকাটা কার্যত অসম্ভব। শিল্পীরা শিক্ষা ও রুচির স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী ওই সমস্ত মূর্তিতে নানা উপাদান যুক্ত করেছেন। ভারতবর্ষে বিষ্ণুর অনন্তশায়ী রূপটি খুব কম পাওয়া গিয়েছে বলেই প্রাগুক্ত গ্রন্থে জানিয়েছিলেন বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ [২৯]। তবে তা ঠিক নয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় বিষ্ণুর অনন্তশায়ী মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। যেমন— দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বোড়ালের সুপ্রসিদ্ধ দেবী ত্রিপুরসুন্দরী মন্দিরের পার্শ্ববর্তী স্তূপ খননের সময় প্রাপ্ত পাল-সেন যুগের অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তি। এই একই স্থানে পাল-সেন যুগে তৈরি হওয়া একটি দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তিও আছে। সেই সঙ্গেই, ওই একই স্থান থেকে অষ্টম শতকে নির্মিত, কালো পাথরের ছোট বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, গুপ্ত অধিকারে আসার পর দীর্ঘকাল লেগেছিল, সাংস্কৃতিক-সমন্বয় ঘটতে। অবিভক্ত বাংলার রংপুর জেলা থেকেও অনন্তশায়ী বিষ্ণুর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার গোকুলনগরের গোকুলচাঁদের পরিত্যক্ত মন্দিরের কাছেই প্রাপ্ত একাদশ-দ্বাদশ শতকে নির্মিত অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্তিটিও উল্লেখযোগ্য। এই জেলায় পরবর্তীকালে টেরাকোটার অলংকরণসহ মন্দির নির্মাণের যে রীতির সূচনা ঘটে প্রধানত মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, তারই হাত ধরে টেরাকোটা রিলিফে অনেক স্থানে কৃষ্ণলীলার পাশাপাশি অনন্তশায়ী বিষ্ণুর রিলিফও দেখা যায়। যদিও বাংলায় বিষ্ণুপূজার আদি নিদর্শন হিসেবে বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের কথা অনেকেই বলেছেন। এই পাহাড়ের একটি গুহায় চক্রচিহ্নের নীচে চতুর্থ শতকের যে গুহালিপিটি খোদাই করা আছে, সেখানে জনৈক রাজা চন্দ্রবর্মা নিজেকে চক্রস্বামীর পূজক বলে দাবি করেছেন। 'চক্র' এবং 'স্বামী'র যুগপৎ সহাবস্থান দেখে অনেকেই মনে করেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই পৌরাণিক বিষ্ণু বাংলার স্থানীয় রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় মান্যতা পেয়েছেন [২৮]। অতএব ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে, তার অনেক আগে থেকেই পৌরাণিক এই দেবতার সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটেছে। তবে সেই পরিচয়ের উৎস কী, তা বলা শক্ত। ব্যবসা-বাণিজ্যও হতে পারে।

কাল্ট হিসেবে না হলেও, সম্ভবত তৃতীয় শতকের কোন এক সময় থেকেই বিষ্ণু বঙ্গদেশে সুপরিচিত একজন দেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির হাত ধরে তাঁর দশাবতার রূপও যে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়, পঞ্চম শতকের প্রথমার্দ্ধে অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বালিগ্রামে স্থাপিত গোবিন্দস্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠায়। এগুলি রাজকীয় দাক্ষিণ্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে, যদি স্থানীয় শাসক বা ভূস্বামীদের উদ্যোগ হয়, তাহলে বলতে হয়, উচ্চবর্ণের অভিজাত সমাজের ঘেরাটোপ ছেড়ে বিষ্ণুর পূজা নানা রূপে জনসাধারণের কাছেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পঞ্চম শতকেরই দ্বিতীয়ার্দ্ধে উত্তরবঙ্গে 'শ্বেতবরাহস্বামী' এবং 'কোকামুখস্বামী' নামে দুই দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠার যে সংবাদ পাওয়া যায় দামোদরপুর পট্টোলি থেকে রায় অনুমান করেন, এই দুজন যথাক্রমে বিষ্ণুর বরাহ-অবতার এবং 'রক্তবরাহরূপী বিষ্ণু' (?) [২৯]। ষষ্ঠ শতকের গুণাইঘর পট্টোলি থেকে ত্রিপুরায় প্রদ্যুম্নেশ্বর এবং সপ্তম শতকের গুণাইঘর পট্টোলি থেকে ত্রিপুরাতেই অনন্তশায়ী বিষ্ণুর পূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত রাজা বুশগুপ্ত কিংবা স্কন্দগুপ্তের সময় থেকেই বাংলা গুপ্তরাজাদের নেকনজরে আসে এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাতেই সম্ভবত বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিষ্ণুপূজা

প্রচলিত হয়। গুপ্ত রাজারা নিজেদের 'পরমভাগবত' বলে দাবি করতে, অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে তাঁরা ছিলেন পৌরাণিক বিষ্ণুর অনুগত। এই কারণেই সম্ভবত সপ্তম শতকের মধ্যেই কেবল বিষ্ণু একা নয়, তাঁর দশাবতার রূপের পূজাও ভালোই প্রচলিত হয়েছিল, যদিও বংশীধারী কৃষ্ণ কিংবা মহাভারতের কৃষ্ণ-পূজার রীতি তখনও শুরু হয় নি।

কোচবিহারে একেবারে হাল আমলে রাজপরিবারের তরফ থেকে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের ফলে এবং তাঁদের পূজিত দেবতা মদনমোহন বলে, প্রথাগত বিষ্ণুমূর্তি এই জেলায় তেমন পাওয়া যায় নি। মালদহের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। যে-যে স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সেখান থেকে দেখা যায়, মালদহে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যা নগণ্য বললেই হয়। অথচ সুপ্রাচীন কাল থেকে মালদহ তথা গৌড়ে ছিল বাংলার সমৃদ্ধ এবং দৃষ্টান্তমূলক নগরসভ্যতা। সুলতানী শাসনের আগেও দীর্ঘকাল ধরে নানা সময়ে গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী। অতএব আর্য-প্রভাব এ-অঞ্চলে পড়েনি, এমন ধারণা করা অমূলক। তা সত্ত্বেও এখানে বিষ্ণুমূর্তি প্রাপ্তির সংখ্যা নগণ্য কেন ? আমাদের মনে হয়, তার অন্তত দু'টি কারণ আছে। অন্যান্য অঞ্চলের মতো মালদহ জেলাতেও বিষ্ণুপূজনের রীতি প্রচলিত থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু প্রাচীন সেই মালদহ যে গঙ্গার উপকূলে গড়ে উঠেছিল, সেই গঙ্গা বারবার তার গতিপথ পরিবর্তিত করায়, বর্তমান গঙ্গার তীরবর্তী মালদহ দেখে প্রাচীন বাংলার মালদহের সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন। এই অঞ্চলের বেশ কিছু অঞ্চল যেমন বর্তমান গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে, তেমনই অনেক অঞ্চলের ভৌগোলিক চেহারাও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ফলে বিষ্ণুমূর্তি কিছু থেকে থাকলেও তা-আর পাওয়া যথেষ্ট কঠিন। দ্বিতীয় কারণটি ঐতিহাসিক এবং আমাদের সকলেরই জানা। দীর্ঘকাল সুলতানী শাসনে থাকার সময় বহু প্রাচীন মন্দির যেমন অবিওলুপ্ত হয়েছে, তেমনই তারই সুযোগে হারিয়ে গেছে নানা ধরণের প্রত্নসামগ্রী। ফলে বিষ্ণুমূর্তি যদি কিছু থেকে থাকেও তা আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি, মালদহ জেলার নানা স্থানে খননের কাজটি আরও সুচারুরূপে করা সম্ভব হলে ভবিষ্যতে কী পাওয়া যাবে, সে-সম্পর্কে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তবে যে-ক'টি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তার বেশিরভাগই পালযুগের শেষ দিক থেকে তুর্কী আক্রমণের পুর্ববর্তী, এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই অঞ্চলের জনবাসীদের মধ্যেও একটি বিষ্ণুকাল্ট গড়ে উঠেছিল, কিন্তু কালের প্রবাহে তা আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

অবিভক্ত মেদিনীপুরে প্রথাগত বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত না হলেও, কেশপুর থানার বাগরুই গ্রামের মাইতিদের লক্ষ্মীবরাহ মন্দির এবং জানাদের লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির বিষ্ণুর রূপভেদ হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ [৩০]। এই মন্দির দুটির মধ্যে প্রথমটিতে পোড়ামাটির টেরাকোটার রিলিফে চৈতন্যপরবর্তীপ্রভাব দেখা যায়। দ্বিতীয়টির অধিকাংশ টেরাকোটা অদৃশ্য, ফলে কিছু বলা সম্ভব নয়। দুটি মন্দিরই অষ্টাদশ শতকের আগে নির্মিত নয়। এই জেলাটি পূর্বে উড়িষ্যার সীমানাভুক্ত ছিল, ফলে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত অনেক জগন্নাথজীউ, রাধাগোবিন্দ, শ্যামসুন্দর প্রমুখের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপূজনের ঐতিহ্য থাকলেও তার চিহ্ন চৈতন্যপরবর্তীকালে লোপ পেয়েছে, অনুমান করা যায়।

সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বেশি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকের সুপ্রাচীন বিষ্ণুমূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এই অঞ্চল থেকেই। কোন কোন মতে, সমতট এবং তার সংলগ্ন অঞ্চল মৌর্য বা কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল [৩১]। রায়দিঘি থানার জটা গ্রামে অবস্থিত জটার দেউল নামক মন্দিরের কাছেই কুষাণ মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। তবে এই প্রমাণ যথেষ্ট নয়। সেকালে রাজমহল থেকে গঙ্গার ধারাপথে সুন্দরবনের খাঁড়ি বেয়ে সমুদ্রে পড়া যেত। ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি সুপরিচিত

জলপথ ছিল এটি। ফলে কুষাণ মুদ্রার উপস্থিতি থেকে কোন কিছুই নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি অনুযায়ী সমতট অঞ্চল ছিল সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত রাজ্যসীমা। এ-দিকে লক্ষ্য রেখে গবেষকদের কেউ কেউ অনুমান করেন যে, সমতটের সংলগ্ন অঞ্চলও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল [৩২]। তবে, তা কোন্ রাজার সময়ে সে-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়েই নানা স্থান থেকে গুপ্তযুগের বিভিন্ন সময়ের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষ করে আদিগঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে গুপ্তযুগের নানা সামগ্রী, মূর্তির ভগ্নাবশেষ থেকে শুরু করে নানা রাজার চিহ্ন-সম্বলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, তা থেকে গুপ্ত রাজাদের প্রভাব সম্পর্কে কিছু অনুমান করা সঙ্গত নয়। তবে একইসঙ্গে অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তির প্রাপ্তি এই অঞ্চলে বিষ্ণুকাল্টের প্রভাবের প্রমাণ বহন করে।

কালিদাস দত্ত, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, সাগর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের অনুসন্ধানের সূত্র ধরে একটি সারণীর সাহায্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির একটি খতিয়ান নেওয়া যেতে পারে, তাহলেই এই অঞ্চলে বিষ্ণুকাল্টের ব্যাপকতা বোঝা সম্ভব হবে।

সারণী- ৩

ক্রমিক সংখ্যা	প্রাপ্তিস্থান	প্রাপ্ত মূর্তির সংখ্যা	মূর্তির রূপগত বিভাগ	উপাদান	আনুমানিক সময়কাল
১	আশুরালি	১	খণ্ডিত বিষ্ণুমূর্তি	কালো পাথর	পাল-সেন যুগ
২	কঙ্কণদিঘি	২	বিষ্ণুপট্ট ও বিষ্ণুমূর্তি	ওই	ওই
৩	কলসা	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
৪	কাকদ্বীপ	১	লোকেশ্বর বিষ্ণু	ওই	নবম শতক
৫	কাটানদিঘি	১	ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি	ওই	?
৬	কালীনগর	১	বিষ্ণু	ওই	নবম শতক
৭	কুমড়াখালি	১	বিষ্ণু	ওই	পাল-সেন যুগ
৮	কুলপী	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
৯	কুমারখালি (ক্যানিং)	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
১০	কৃষ্ণচন্দ্রপুর	১	ভগ্ন বিষ্ণু	ওই	একাদশ শতক
১১	খাড়ি	২	বিষ্ণু	কালো পাথর	দশম-একাদশ শতক
১২	গজমুড়ি (উজোড়মাধব গ্রাম থেকে পাওয়া)	১	বিষ্ণু	ওই	পাল-সেন যুগ
১৩	গিলার হাট	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
১৪	পশ্চিম ভদ্র পাড়া (গিলারহাট)	১	বিষ্ণু	ধাতু	?
১৫	নারায়ণীপুর	১	বিষ্ণু	কালো পাথর	?

১৬	গরাণকাঠি (গোপালগঞ্জ)	১	খণ্ডিত বিষ্ণুমূর্তি	ওই	?
১৭	গোসাবা	১	দ্বিবাহু বিষ্ণুমূর্তি	ওই	গুপ্তযুগ
১৮	জলঘাটা	৩ ১	বিষ্ণু গড়ুরস্তম্ভ	ওই	একাদশ শতক
১৯	জয়নগর	১	ত্রিবিক্রম বিষ্ণুমূর্তি	ওই	পাল-সেন যুগ
২০	ডিঙ্গেলপোতা	১	চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির উর্দ্ধাংশ	ওই	ওই
২১	দক্ষিণ গোবিন্দপুর	৫	চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি	ব্যাসল্ট পাথর	দ্বাদশ শতক
২২	দক্ষিণ শিবগঞ্জ	১	চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি	কালো পাথর	পাল-সেন যুগ
২৩	কার্জন ক্রিক	১	নৃসিংহদেব	ওই	ওই
২৪	বৈরাগীপাড়া	১	খণ্ডিত বিষ্ণুমূর্তি	ওই	ওই
২৫	দামোদরপুর	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
২৬	দুর্গার চক	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
২৭	ধবলাট (প্রসাদপুর)	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
২৮	নলগোড়া	২	বিষ্ণু	ওই	ওই
২৯	পঞ্চগ্রাম	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
৩০	পাকুড়তলা (নেবুতলা)	১	বিষ্ণু দুই হাতের কনুই থেকে আরও দুটি হাত বের হয়েছে	ওই	ওই
৩১	পাঁচঘরা	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
		১	নৃসিংহদেব	ওই	ওই
		১	নৃত্যরত বিষ্ণু	ওই	ওই
৩২	ফলতা	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
৩৩	ফুলবাড়ি	১	বিষ্ণু / মতান্তরে সূর্য	ওই	পাল যুগ
৩৪	বনশ্যামনগর	১	চতুর্ভুজ বিষ্ণু	কালো পাথর	পাল-সেন যুগ
৩৫	বহড়ু	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
৩৬	ব্রহ্মপুর	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
৩৭	বাগমারি	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
৩৮	বাড়িভাঙা	৩	বিষ্ণু	ওই	ওই
৩৯	বড়িশা	১	বিষ্ণু	চুনাপাথর	ত্রয়োদশ শতক
৪০	বেহালা	১ ২	বিষ্ণু বিষ্ণু	কালো পাথর	পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক দ্বাদশ শতক

৪১	বোড়াল	১ ১ ১	বিষ্ণু বিষ্ণু অনন্তশায়ী বিষ্ণু	কালো পাথর ওই ওই	অষ্টম শতক পাল-সেন যুগ ওই
৪২	ভাঙ্গড়- রঘুনাথপুর হাতিশালা ধাড়া দিঘিরপাড় সিংহেশ্বর	১ ১ ১ ১ ১	ত্রিবিক্রম বিষ্ণু বিষ্ণু বিষ্ণু / মতান্তরে সূর্য বিষ্ণু বিষ্ণু (ভগ্ন)	ওই ওই ওই ওই ওই	পাল-সেন যুগ ওই ওই ওই ওই
৪৩	মহেশপুর	১	চতুর্ভুজ বিষ্ণু	ওই	ওই
৪৪	মাধবপুর	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
৪৫	মাহিনগর	১	বিষ্ণু	ওই	ওই
৪৬	যাদবনগর	১	বিষ্ণু (ভগ্ন)	ওই	ওই
৪৭	রাজপুর	১	বিষ্ণু (ভগ্ন)	ওই	দশম শতক
৪৮	রামরতনপুর	১	ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তির খণ্ডিত হাত	ওই	পাল-সেন যুগ
৪৯	রায়দিঘি	৩	বিষ্ণু	ওই	??
৫০	শাহজাদাপুর	১	বিষ্ণু	ওই	পাল-সেন যুগ
৫১	শ্রীকৃষ্ণনগর	১	বিষ্ণু (ভগ্ন)	ওই	??
৫২	নারায়ণপুর	১	বিষ্ণু	ওই	পাল-সেন যুগ
৫৩	সরবেড়িয়া	১	বিষ্ণু (ভগ্ন)	ওই	??
৫৪	সাগর	১	বিষ্ণু	বেলেপাথর	??
৫৫	হরিণবাড়ি	১	বিষ্ণু	কালো পাথর	পাল-সেন যুগ
৫৬	সীতাকুণ্ড	২ ১	বিষ্ণু বরাহ-অবতার এছাড়াও আরও কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে।	ওই ওই	ওই ওই
৫৭	সোনারপুর	১	বিষ্ণু	কালো পাথর	একাদশ-দ্বাদশ শতক
মোট		~৮৩			

প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্ত মোট বিষ্ণুমূর্তির সংখ্যা বিরাশিটিরও বেশি। তাও অধুনালুপ্ত মনি নদীর অববাহিকার অনেক অংশে উৎখনন হয় নি, হলে সংখ্যাটি যে আরও বাড়বে, সন্দেহ নেই। এপার-ওপার বাংলা মিশিয়ে এতগুলি বিষ্ণুমূর্তির সন্ধান আর কোন অংশ থেকে পাওয়া যায় নি। এর থেকে অনুমান করা চলে, দক্ষিণ বঙ্গে সমতট-সীমানাবর্তী এলাকায় বিষ্ণুভক্তির সূচনা হয় গুপ্তযুগ থেকেই। পরে পাল রাজাদের আমলে তা আরও পুষ্ট হয়। পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও পরমতসহিষ্ণু ছিলেন, ফলে হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর

মূর্তিনির্মাণ এবং পুজাপাঠে বাধা ছিল না। সেন রাজাদের আমলে তো দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির হাত ধরে বিষ্ণু"স্বামী" আরও জাঁকিয়ে বসেন। এই কারণেই প্রাপ্ত মূর্তিগুলির অধিকাংশই পাল রাজত্বের শেষ দিক থেকে সেন রাজত্বের মধ্যবর্তী সময়ের সৃষ্টি। রাজমহল এবং উড়িষ্যা থেকে আনা ব্যাসল্ট পাথরে অধিকাংশ মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। চুনাপাথর ও বেলেপাথরের তৈরি মূর্তি হাতে গোনা দু-একটিই পাওয়া গিয়েছে। মূর্তিগুলির নির্মাণশৈলী দেখে বোঝা যায়, এগুলি একটি বিশেষ স্কুলের সৃষ্টি। অধিকাংশ মূর্তিতে স্বাতন্ত্র্যের অভাব প্রকট। তবে তখনও বাঙালির হাতের ভাস্কর্য স্থূলতায় পর্যবসিত হয় নি। সুক্ষ্ম ও সুডৌল নির্মাণশৈলী মূর্তিগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের দিকে নির্মিত মূর্তিগুলির মতো আড়ষ্ট বা প্রাণহীন করে তোলেনি। রাষ্ট্রিক বিপর্যয় বাঙালি শিল্পীর সুকুমার কলার উপর আঘাত এনেছিল তা অনুমান করা যায়। দু'একটি রূপভেদ পাওয়া যায়, যেমন বরাহ, নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম—যা তাৎপর্যপূর্ণ। তবে পৃথক কোন বিষ্ণুমন্দির তেমন একটা পাওয়া যায় নি, হয় সেগুলি বাংলার আবহাওয়ায় গুণে আগেই লুপ্ত হয়েছে, কিংবা রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের দিনে ধ্বংস হয়েছে। তবে সাধারণভাবে ধারণা করা চলে যে, অন্য দেবদেবীর মন্দিরেও বিষ্ণুমূর্তি রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। যাই হোক, সমতট এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে বিষ্ণুকাল্ট যে বেশ কয়েক শতাব্দীর জন্য জাঁকিয়ে বসেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি ছিল নিমবঙ্গের সংস্কৃতি। বৃন্দাবনদাস তৎকালীন নদীয়া-শান্তিপুরের চিত্র আঁকতে গিয়ে যে কথা বলেছিলেন (প্রবন্ধের শুরুতেই তার উল্লেখ আছে), তা সত্য হলেও আংশিক অঞ্চলের ক্ষেত্রে সত্য। বাঁকুড়া, হাওড়া জেলার একাংশে কিন্তু বিষ্ণুপূজা রীতিমতো চতুর্দ্দশ শতকের আগে পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মতো এত বেশি না হলেও, হাওড়া জেলাতেও বাসুদেব-বিষ্ণুর পূজার ব্যাপকতা ছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, হাওড়া জেলাতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির খতিয়ান নিম্নরূপ—

সারণী- ৪

হাওড়া জেলায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি

ক্রম	প্রাপ্তিস্থান	সংখ্যা	মূর্তির রূপভেদ	সময়কাল	উপাদান
১	আমতা	১	বিষ্ণু	পাল-সেন যুগ	কষ্টিপাথর
২	খালোড়	১	বিষ্ণু / ধর্মরূপে পূজিত	পাল-পরবর্তী যুগ	কালো পাথর
৩	চাঁদুল কুমোরডাঙ্গা	১	বিষ্ণু	পাল যুগ	ওই
৪	চোঙঘুরালি	১	বিষ্ণু	পালযুগ	ক্লোরাইট
৫	জগৎবল্লভপুর	১	বিষ্ণু (ভগ্ন)	একাদশ-দ্বাদশ	কালো পাথর
৬	জয়পুর	১	বিষ্ণু	একাদশ-দ্বাদশ	ওই
৭	তেলহাটি	১	বিষ্ণুপট্ট	একাদশ শতক	ওই
		১	বিষ্ণু (ভগ্ন)	একাদশ শতক	ওই
৮	নবাসন	১	বিষ্ণু এখানে একটি কালীমূর্তির চালচিত্রে আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের দিকে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তির রিলিফ দেখতে পাওয়া যায়।	পাল-সেন যুগ	ওই

৯	নিজবালিয়া	১	বাসুদেবমূর্তি দশাবতার রিলিফের কাজযুক্ত। মূর্তির পদতলে গরুড়ের মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়।	একাদশ শতক	কষ্টিপাথর
১০	নুনেবাড়	১	বিষ্ণু (ভগ্ন)	দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক	ওই
১১	পোলগুস্তিয়া	একাধিক	বিষ্ণু এখানে একটি সমৃদ্ধ বিষ্ণুপূজনের অঞ্চল গড়ে উঠেছিল, যে-কারণে একাধিক বিষ্ণুমূর্তির খণ্ডিত বা পূর্ণ মূর্তি পাওয়া যায়।	একাদশ-দ্বাদশ শতক	কালো পাথর
১২	বাছরী	১	বিষ্ণু (ভগ্ন)	একাদশ-দ্বাদশ	কষ্টিপাথর
১৩	বাঁটুল	১	বাসুদেব	দ্বাদশ-ত্রয়োদশ	ওই
১৪	বালীগ্রাম	২	বিষ্ণু	একাদশ-দ্বাদশ	কালো পাথর
১৫	বালীটিকুরী	১	বিষ্ণু	দ্বাদশ শতক	কষ্টিপাথর
১৬	মাড়ঘুরালি	১	বিষ্ণু	দ্বাদশ-ত্রয়োদশ	সবুজ ক্লোরাইট
১৭	মেল্লক	একাধিক	বাসুদেব	পালযুগ	কষ্টিপাথর
১৮	হরিনারায়ণপুর	একাধিক	বাসুদেব	দ্বাদশ-ত্রয়োদশ	ওই

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, হাওড়া জেলায় ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান না চালিয়েও প্রাপ্ত বিষ্ণু-বাসুদেবের মূর্তির সংখ্যা পঁচিশেরও বেশি। যথাযথ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালালে যে সংখ্যাটি আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে, সন্দেহ নেই। যা দেখে প্রত্নসমীক্ষকদের কেউ কেউ বলেছেন, "বাসুদেব-বিষ্ণু উপাসনার নজির এ অঞ্চলে এত বেশী যে, সন্দেহ হয় এই ভূভাগ মহাযানী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল-রাজাদের শাসনবহির্ভূত ছিল।"[৩৩] যদিও গঙ্গা তথা ভাগীরথীর গতিপথ বিচার করলে বর্তমান হাওড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পাল-রাজাদের শাসন-বহির্ভূত ছিল, এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। সম্ভবত কারণটা অন্য। দেখা যাচ্ছে, বাণিজ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির অববাহিকার দুই তীরেই বিষ্ণুমূর্তি বেশি পাওয়া গিয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, বর্তমানে লুপ্ত ভাগীরথীর অন্যতম শাখা মনিনদীর অববাহিকার দুই পাশেই বিষ্ণুমূর্তি প্রাপ্তির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য নদীগুলিও আছে, যা আগে যে খাতে বইত, পরে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তর্বর্তী জনপদে পরিণত হয়। বাণিজ্যের সূত্রেও বিষ্ণুপূজনের রীতি ক্রমশ অববাহিকা অঞ্চলগুলিতে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হয়ে থাকতে পারে। অধুনা বাংলাদেশের বাখাউরা গ্রামে মহীপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের একটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সমতটের জনৈক বণিক "পরমবৈষ্ণব লোকদত্তে"র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর থেকে অনেকেই অনুমান করেন, সমতট ও সংলগ্ন অঞ্চলে এবং অবশ্যই নদী-অববাহিকার দু'পাশে বিষ্ণুমূর্তিপ্রাপ্তির প্রধান কারণ, গুপ্ত আমল থেকে বিষ্ণু ছিলেন মূলত বণিকদেরই উপাস্য দেবতা এবং তাঁদের হাত ধরেই এই বাংলার অববাহিকা-অঞ্চলে বিষ্ণুপূজনের সংস্কৃতি প্রচলিত হয় [৩৪]। বিষয়টি নিছকই অনুমান নয়। আজ পর্যন্ত ভারতের পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ যা উৎখনন করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, নদী থেকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধারের

সংখ্যা নামমাত্র। তার মধ্যে কোন কোনটি ভিন্ন অঞ্চল থেকে নিজ অঞ্চলে নিয়ে আসা। যে-ভাবে রাজমহল পাহাড়ের পাথরে প্রস্তুত প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মনি নদীর অববাহিকায়, এবং অনেকেই অনুমান করেন, তা এসেছে নদীপথে বাহিত হয়ে [৩৫], তেমনভাবে বিষ্ণুমূর্তিও আসতে পারে। হুগলী নদীর দুই তীরেও একারণেই সমৃদ্ধ বিষ্ণুকাল্ট গড়ে উঠেছিল দেখা যায়। এই অঞ্চলে পোড়ামাটির যে-সব মূর্তি-ভাস্কর্য সুদূর অতীতে নির্মিত হয়েছিল, জলবায়ু এবং বহিঃশত্রুর কল্যাণে তার বেশিরভাগই লুপ্তপ্রায়। তবে এই অঞ্চলে এত সংখ্যক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া যায় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর সুপ্রাচীন দরগায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে দরগার ভিতের চারপাশে খনন করে হিন্দুস্থাপত্য এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমার বিষ্ণুমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে সপ্তম-অষ্টম শতকের মূর্তিও আছে। পাণ্ডুয়ার কানুর গ্রামে সেনযুগে নির্মিত তিনটি পূর্ণ এবং একটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। হরিপাল থানার কৈঁকালার কাছে কৌশিকী নদী থেকে চতুর্ভুজ দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এই জেলায় সর্বপ্রথম প্রাপ্ত দত্তায়ের মূর্তি। এই জাতীয় মূর্তিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর একই সঙ্গে বিরাজ করেন। একাদশ শতকের দিকে হুগলী নদীর অববাহিকায় দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তির পূজা ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল বলে কেউ কেউ অনুমান করেছেন [৩৬]। তারকেশ্বর থানার বাহিরখণ্ডের কাছে সরস্বতী নদীর গর্ভের বালি খুঁড়ে একটি উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এ-সমস্তই নির্দেশ করে যে, সেকালে হুগলী ছিল একটি সমৃদ্ধ বিষ্ণুপূজক এলাকা (zone)। উপযুক্ত অনুসন্ধান না হলে সে-সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব নয়।

যথাযথ উপাদান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের অভাবে এই বাংলায় প্রাচীন কালে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের আগে নগরবিন্যাস কেমন ছিল তা বোঝার উপায় নেই। কয়েকটি অঞ্চল অবশ্য বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে স্পষ্ট হয়, কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই শাসন-ক্ষমতার কেন্দ্র। এর বাইরে অধুনা যাকে মফস্‌সল বলে, অর্থাৎ ছোট ছোট শহর, সেগুলি কোথায় কোথায় ছিল, কেমন তার চরিত্র ছিল, সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে তা জানার আজ আর কোন উপায় নেই। কিন্তু নদী অববাহিকার তীরে পাল-সেন যুগের অনেক আগে থেকেই, সম্ভবত গুপ্ত যুগের মাঝামাঝি থেকেই যে ছোট ছোট বন্দর-শহর গড়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এই জাতীয় শহরে পাল যুগের আগে থেকেই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস ছিল। অন্তত জৈন এবং হিন্দু ধর্মের মানুষেরা তো ছিলেনই। পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তবে সম্প্রদায়গত মত ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতেন। যে-কারণে পাল-সেন যুগে কী নিম্নবঙ্গ, কী মধ্যবঙ্গ—কোথাও আপাত বিরোধ ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য গুপ্তযুগেও এই বিরোধ ছিল না। বাংলায় গুপ্ত যুগের যে-সব তাম্রশাসন ইত্যাদি পাওয়া গেছে, তার কোন কোনটিতে রাজা কর্তৃক বিষ্ণুপূজনের জন্য ভূমিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন—বাংলাদেশের বগুড়া জেলার বাইগ্রামে কুমারগুপ্তের শাসনকালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে, সেখানে গোবিন্দস্বামীর মন্দিরের নিত্যপূজার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যেই করমুক্ত জমি এবং দুই দ্রোণ বাস্তুজমি দেওয়া হয়েছে [৩৭]। আবার, বৌদ্ধসঙ্ঘের জন্য ভূমিদান ইত্যাদির উল্লেখও পাওয়া যায়। যেমন- বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রশাসনে মহাযান বৌদ্ধ ভিক্ষুদের স্থানীয় বিহারের নিত্য আরাধনা এবং আহার্যসহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য এগারো খিলপাটক জমি দান করেছিলেন [৩৮]। পরমতসহিষ্ণুতার এই দৃষ্টান্ত পাল যুগেও অপ্রতিহত ছিল। তবে পাল যুগের শেষ দিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের প্রাবল্য দেখা দেয় এবং সেন রাজত্বের সূচনা থেকেই পরমতসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে একটা আঘাত এসে নামে। ব্রাহ্মণ্য শক্তি বৃদ্ধি পায়, ফলে বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা পিছু হটতে থাকে। সেই কারণেই সেন যুগের শেষের দিকে বিষ্ণুপূজনের রীতি নতুন করে

বৃদ্ধি পায়। একাদশ-দ্বাদশ শতকের দিকে নির্মিত একাধিক মূর্তিই তার প্রমাণ। তবে পাল-সেন যুগে সম্মিলিতভাবে বিষ্ণুকাল্ট অভিজাত হিন্দুদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল। সাধারণ মানুষেরা তখনও শিব এবং লৌকিক দেবদেবীর পূজা করত, অবশ্য বাণিজ্যজীবী সম্ভ্রান্ত পরিবারেও শিবপূজার ঐতিহ্য বর্তমান ছিল। 'মনসামঙ্গলে'র কাহিনিতে বাঙালির অতীত ধর্মাচরণেরও একটি সত্য ইতিহাস নিহিত আছে। তবে, শৈব মতের সঙ্গে বিষ্ণুভজনার আপাত কোন বিরোধ প্রাচীন বাংলায় ছিল না। তবে কালের নিয়মে ত্রয়োদশ শতকের রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের পরে বিদেশী শাসকের আক্রমণে বিপর্যস্ত বাঙালি পৌরাণিক দেবতাদের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে লৌকিক দেবদেবীর উপরে আস্থা স্থাপন করে। বিষ্ণুকাল্ট সেদিন থেকেই বেসামাল হয়ে পড়ে, পরবর্তীতে চৈতন্যদেবের উত্থান বাঙালি ধরণে কৃষ্ণভজনার প্রচলন ঘটায় এবং অচিরেই ভক্তিধর্মের বানে সকলে ভেসে যায়, এ-বঙ্গের বিষ্ণুকাল্টও সেদিন আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়।

সিদ্ধান্ত

সমৃদ্ধ এবং প্রায় হাজার বছরের পুরানো বিষ্ণুকাল্ট সত্ত্বেও এই বঙ্গের প্রাচীন কাব্য-কবিতায় বিষ্ণু উপেক্ষিত এক দেবতা মাত্র। আর্য ভাব থেকে বেরিয়ে বাঙালির ঘরের ছেলে হয়ে উঠতে পারেন নি বলেই, উত্তরকালেও তিনি পৃথকভাবে গৃহীত হলেন না। অন্যান্য দেবদেবীকে নিয়ে মঙ্গলকাব্য লেখা হলেও বিষ্ণুমঙ্গলের কোন দৃষ্টান্ত একাল অবধি এসে পৌঁছায় নি। সাধারণ মঙ্গলকাব্যগুলির কোথাও কোথাও বিষ্ণুর উল্লেখ করা হয়েছে নিয়মরক্ষার্থে। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত প্রমুখের 'মনসামঙ্গল'-এ অন্য বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কোন প্রসঙ্গ বা বন্দনা নেই। 'চণ্ডীমঙ্গলে' কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী চৈতন্য এবং গোবিন্দের বন্দনা করেছেন [৩৯], কিন্তু 'বিষ্ণু'র বন্দনা সঙ্গতকারণেই করেননি, কারণ তিনি উত্তর-চৈতন্যপর্বের কবি। চৈতন্যোত্তর পর্বের কবি রূপরামও তাঁর কাব্যে চৈতন্য বন্দনা শুরু করেন, বিষ্ণুর প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না বললেই চলে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যগুলির মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে দিগ্‌বন্দনা নেই, অতএব বিষ্ণুর প্রসঙ্গ নেই। মানিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে অবশ্য বিস্তৃতভাবে আছে [৪০]। কিন্তু মানিকরাম একান্তভাবেই আধুনিককালের কবি। অতএব তাঁর গ্রন্থে বিষ্ণু বা নারায়ণ-প্রসঙ্গ যতই বিস্তৃতভাবে থাক না কেন, তার দ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালের বিষ্ণুপূজার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। পঞ্চদশ শতকের কবি মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" বা "গোবিন্দমঙ্গল" লিখতে গিয়ে 'বন্দনা' অংশে বিষ্ণুর দশাবতার রূপ বর্ণনা করেই [৪১] তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের কথায় চলে গিয়েছেন। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর কিছু আগে থেকেই পৌরাণিক বিষ্ণুর পরিবর্তে তাঁর অবতার হিসেবে কীর্তিত শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব ধীরে ধীরে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছেন। তবে আগেই বলা হয়েছে, পুরাণের কৃষ্ণ-বাসুদেব এবং ভাগবত ও মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একেবারেই এক নয়। প্রাচীন বঙ্গে বিষ্ণুর যে-সংখ্যক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সে তুলনায় খুব কম সংখ্যক মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে বাসুদেবের। অথচ গ্রীক ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্যে জানা যায়, বাসুদেব-পূজার রীতি সুদীর্ঘকাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং জনপ্রিয়ও হয়েছিল। তবে গুপ্তবংশীয় রাজারা ভাগবতের অনুসরণে বিষ্ণুপূজার যে রীতিকে গ্রহণ করেন, তা এ-বঙ্গে প্রবেশ করে সার্বিক কাল্টের রূপ নেয় এবং সেই কারণেই এখানে বিষ্ণুর মূর্তি তাঁর অন্য রূপের চেয়ে অনেকটাই বেশি পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। হয়তো উপযুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ হলে আরও অনেক বেশি সংখ্যক বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করা সম্ভব হত। কিন্তু এই বিষ্ণুকাল্ট গুপ্তযুগ থেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের পরে আর দীর্ঘায়িত হয় নি, অনুমান করা চলে। এই সময়ের পরে নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি প্রায় নেই বললেই চলে। শৈবধর্ম যেমন ধারাবাহিকভাবে এ-বঙ্গে তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল, বিষ্ণু তেমনটি পারেন নি। তার একটা কারণ সহজেই অনুমান করা

যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, মূলত বণিক এবং সাধারণ ব্যাপারীরা ছিলেন বিষ্ণুপূজার ধারক-বাহক। গুপ্তযুগ থেকে পাল-সেন যুগ পর্যন্ত বাংলায় আপাতভাবে শান্তিশৃঙ্খলা এবং সমৃদ্ধি বজায় ছিল। বাণিজ্যে বাঙালি এই সময় যে সফলতার শীর্ষে ওঠে, তারই স্মৃতি উত্তরকালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যগুলিতে ধরা আছে। কিন্তু দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের পর একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণে বাংলার বাণিজ্য এবং অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার ফলে বণিকশ্রেণির প্রাধান্য এবং ক্ষমতা হ্রাস পায়। বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিংবা কোনরকমে বজায় থাকায় বেনিয়াশ্রেণির বিষ্ণুভক্তিতে ভাঁটা পড়ে। বেনিয়াদের আর্থিক কৌলিন্য হ্রাস পাওয়ায় ব্রাহ্মণরাও বিপদের সম্মুখীন হন, কারণ সাধারণভাবে তাঁরাও ছিলেন বণিকতন্ত্রজীবী। কিন্তু নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে যখন সার্বিক সম্মিলনের প্রয়োজন হল, তখন অভিজাতদের হাতে পূজিত দেবতা বিষ্ণু আর গৃহীত হলেন না। নতুন কাল বাঁচবার তাগিদে বহিরাগত আর্য সংস্কৃতির দেবদেবীর পরিবর্তে শিব, মনসা, চণ্ডী প্রমুখ অনার্য দেবদেবীর কাছেই আবার ফিরে এলেন। তাছাড়া বিষ্ণুপূজা যতটা অভিজাত-সমাজ-কেন্দ্রিক ছিল, ততটা লোকায়ত হয়ে উঠতে পারেনি বলেই মনে হয়। সেই কারণেই বিষ্ণু তাঁড় নিজস্ব রূপে আর ফিরে এলেন না। উত্তরকালের বৈষ্ণবধর্ম এবং তার ভজন-পূজন রীতি বিষ্ণুপূজার রীতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বৈদিক কিংবা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ছাড়াই কৃষ্ণপূজনের যে সহজিয়া রীতি চৈতন্যদেব চালু করে গিয়েছিলেন, তার আকর্ষণে বাঙালি বিমোহিত হয়ে গিয়েছিল। আদতে চৈতন্য সুকৌশলে বিষ্ণুভজনার রীতিকে লোকায়ত করে তুললেন বলেই তা জনমানসে চিরস্থায়িত্ব লাভ করতে পেরেছিল। পৌরাণিক আভিজাত্যমণ্ডিত বিষ্ণুর পরিবর্তে ঘরের ছেলেটি যেন, এই রূপে কৃষ্ণ দেখা দিলেন, গড়ে উঠল বৈষ্ণব-পদাবলীর উত্তরাধিকার। সাধারণ মানবিক অনুভূতি-দোষ-ত্রুটি ইত্যাদির সাপেক্ষে নতুন এই দেবনির্মাণকে সাধারণ মানুষের গ্রহণ করতে অসুবিধে হল না। এ ভাবেই শ্রীচৈতন্যের হাত ধরে কৃষ্ণ বাঙালিজীবনে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে বিষ্ণুরূপে এই বৈদিক দেবতা আর কোনদিন স্বমহিমায় এ-বঙ্গে ফিরে আসতে সমর্থ হন নি।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

[১] বৃন্দাবন দাস, "চৈতন্যভাগবত", সুকুমার সেন সম্পাদিত, ২য় মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী , পৃ. ৭, (১৯৯১)।

[২] রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত, "ঋগ্বেদ-সংহিতা", ১/২২/১৩—২১, হরফ সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১০২-১০৩, (১৯৯৩)।

[৩] হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, "হিন্দুদের দেবদেবী", প্রথম সংস্করণ, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, পৃ. ৩৮৯-৯০, (১৯৬০) ।

[৪] জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পঞ্চোপাসনা", প্রথম সংস্করণ, ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায়, কলকাতা , পৃ. ৫৫, (১৯৬০)।

[৫] পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, "বিষ্ণুপুরাণম্", ১/২/১-২, প্রথম নবভারত সংস্করণ, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪, (১৩৯০ বঙ্গাব্দ)।

[৬] তদেব, পৃ. ৯।

[৭] পরিতোষ ঠাকুর অনূদিত, "সামবেদ-সংহিতা", প্রথম সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৫৪, (১৯৭৫)।

[৮] ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী অনূদিত ও সম্পাদিত, "রামায়ণম্", প্রথম খণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০/৫৮-৫৯, তথাগত সংস্করণ ২০২১, তথাগত, কলকাতা, পৃ. ৭৮৭, (২০২১)।

[৯] রজনীকান্ত গুহ, "মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ", (আখ্যাপত্র বিনষ্ট), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা, পৃ. ১৭০ (?)।

[১০] ভাণ্ডারকর, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা একই কথা মনে করেন। দ্র. জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যেয়ের প্রাগুক্ত গ্রন্থ।

[১১] S. K. De, "Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal", 1st Ed., General Printers and Publisher LTD, Kolkata, p. 6, (1942).

[১২] S. Kramrisch, "Indian Sculpture", 1st Ed., Y.M.C.A publishing house, Calcutta, p. 71-72, (1933).

[১৩] স্বামী নির্ম্মলানন্দ, "দেবদেবী ও তাঁদের বাহন", ষষ্ঠ সংস্করণ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, কলকাতা, পৃ. ৯০, (১৪১০ বঙ্গাব্দ)।

[১৪] R. C Majumder, "The History of Bengal", fourth impression, university of Dacca, Ramana, Dacca , **vol. I**, p. 47, (2006).

[১৫] S. R Goyel, "the Imperial Guptas", 1st Ed., Central Book Depot, Allahabad, p. 4, (1967).

[১৬] রমাকান্ত চক্রবর্তী, "বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম", তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১১, (২০০৯)।

[১৭] R. D Banerjee, "The Age of the Imperial Guptas", 1st Ed., The Benares Hindu University, Benares, p. 102, (1933).

[১৮] অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি", তৃতীয় মুদ্রণ, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা,পৃ. ৮, (২০১৫)।

[১৯] রমাকান্ত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

[২০] দ্র. D. D Kosambi, V.V. Gokhle ed, "Subhasitaratnakosa", Cambridge, Mass, Harvard University Press, See Introduction.(1957).

[২১] অরুণ নাগ সম্পাদিত, "হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা", দ্বিতীয় আনন্দ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪২, (২০০৮)।

[২২] দ্র. R.Mukherjee & S. Kumar Maity ed, "Copus of Bengal Inscription", Firma K. L. Mukhopadhyay, Kolkata, (1967).

[২৩] রমাকান্ত চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

[২৪] বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ, "বিষ্ণু-মূর্তি-পরিচয়", সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাবলী সং ৩১, সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২, (১৩১৭ বঙ্গাব্দ)।

[২৫] তদেব, পৃ. ৪-৬।

[২৬] তারাপদ সাঁতরা, "জলপাইগুড়ি জেলার পুরাকীর্তি", প্রথম সংস্করণ, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ২৮, (২০০০)।

[২৭] তারাপদ সাঁতরা, "হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি", দ্বিতীয় মুদ্রণ, পূর্ত (পুরাতত্ত্ব) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৭৯, (২০১৫)।

[২৮] নীহাররঞ্জন রায়, "বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব", দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, দে'জ, কলকাতা, পৃ. ৪৯৮, (১৪০২ বঙ্গাব্দ)।

[২৯] তদেব, পৃ. ৪৯৮।

[৩০] প্রণব রায়, "মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ",প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১৭৯, (২০১৭)।

[৩১] সাগর চট্টোপাধ্যায়, "দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পুরাকীর্তি", প্রথম সংস্করণ, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ১৯৮, (২০০৫)।

[৩২] নীহাররঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

[৩৩] তারাপদ সাঁতরা, "হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি", প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

[৩৪] কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, "বাংলার ভাস্কর্য", সুবর্ণরেখা প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, পৃ. ১৪৭, (২০১৪)।

[৩৫] দিলীপকুমার চক্রবর্তী, "ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস",চতুর্থ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ১৫, (২০১২)।

[৩৬] সুধীরকুমার মিত্র, 'হুগলী জেলার দেবদেউল',প্রথম অপর্ণা সংস্করণ, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, পৃ. ১৪, (১৯৯১)।

[৩৭] Radhagovinda Basak, "Baigram copper-plate inscription of the [gupta]-year 128"; EPIGRAPHIA INDICA,**Vol. XXI**, p. 79 (1931-32).

[৩৮] M. Ghose, "The Newly-Discovered Gunaighar Grant", Indian Historical Quarterly, **Vol. 6**, P. 561. সতীশ চন্দ্রও একই কথা বলেছেন যে, "Although the Palas were supporters of Buddhism, they also extended their patronage to Saivism and Vaishnavism." S. Chandra, "History of Medieval India", Orient Longman impression reprint, Orient BlackSwan, Delhi, p. 14-15, (2009).

[৩৯] কবিকঙ্কণ বিরচিত, "চণ্ডীমঙ্গল", সুকুমার সেন সম্পাদিত, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, পৃ. ২-৩, (১৯৯৩)।

[৪০] মানিকরাম গাঙ্গুলি, "ধর্মমঙ্গল", বিজিতকুমার দত্ত ও সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১০-১২, (২০০৯)।

[৪১] মালাধর বসু, "শ্রীকৃষ্ণবিজয়", মিত্র, খগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৩-১১, (২০১১)।

Research Article

উত্তরবঙ্গের লৌকিক জীবনে শিবের রূপবৈচিত্র্য

অদ্রিজা চৌধুরী

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ই-মেইল : chaudhuriadrija@gmail.com

Received: 20th January 2022 Revised: 18th May 2022 Accepted: 20th May 2022

সংক্ষিপ্তসার: শিবচেতনার উৎসমুখ প্রাগার্য সভ্যতা। তাই পরবর্তীতে শিবের আর্যীকরণ হলেও তিনি রয়ে গেলেন একইরকম ভাবে কৌমগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে। শিবের সেই লোকায়ত রূপের চিহ্ন আমরা দেখি একাধিক বাংলা মঙ্গলকাব্যে এবং অসংখ্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতাবলীতে। এছাড়াও বাংলার লোকসংস্কৃতিতে তিনি রইলেন অসংখ্য নাম না জানা স্রষ্টার ছড়ায়-গানে, প্রবাদে, ব্রতকথায়। সমগ্র বাংলা জুড়েই লৌকিক জীবনে তাঁর অসংখ্য রূপ, অজস্র নাম। ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা শিবের এই রূপবৈচিত্র্য ও তাঁর পূজাপদ্ধতি। তারমধ্যে উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে তিনি রয়েছেন সন্ন্যাসী ঠাকুর রূপে, কোথাও মাশান রূপে, কোথাও বা বাবাঠাকুর, ত্রিনাথ, মহারাজ ঠাকুর ইত্যাদি নানা পরিচয়ে। কোথাও হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে বাঁচতে কোথাও বা ফসলের উৎপাদনের কামনায় চলে তাঁর আরাধনা। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে শিবের সেই রূপগুলিকেই সন্ধান করা হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে শিবের সেই লৌকিক রূপ সংক্রান্ত ছড়া, গান ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিবের এই লৌকিক রূপগুলির পরিচয় স্পষ্ট করা হবে এই গবেষণাপত্রে।

সূচকশব্দ: উত্তরবঙ্গ, শিব, লোকসংস্কৃতি, ক্ষেত্রসমীক্ষা, রূপবৈচিত্র্য, কৃষিদেবতা, লিঙ্গ, লোকদেবতা।

ভূমিকা

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—এই তিন কারণের আধার যিনি; শান্ত, সুন্দর ও মঙ্গলময় যিনি; সমগ্র জীবজগতের প্রাণের আধার যিনি সেই দেবাদিদেব যোগেশ্বর মহাদেব ভারতবর্ষের প্রধানতম পূজ্য দেবতা, ভারতবর্ষীয় ধর্মের ঘনীভূত স্বরূপ। সুউচ্চ হিমালয়ের শ্বেতশুভ্র বরফাবৃত পর্বতমালার বুকে কোথাও তিনি কেদারনাথ রূপে সৌম্যকান্তি নিরাভরণ এক বিরাটাকার তেজস্বী পুরুষ যেন যোগাসনে স্তব্ধ, নিশ্চল। আবার গ্রামবাংলার কোনো এক অখ্যাত গাছতলাতেও তিনিই 'বুড়াঠাকুর' হয়ে বিরাজমান। কাশীতে যিনি বিশ্বনাথরূপে সর্বত্যাগী ভিখারী তিনিই আবার গ্রামবাংলার পালাগানে হাতে লাঙল নিয়ে মিশে যান ক্ষুধার্ত গণজীবনের অভ্যন্তরে। 'কুমারসম্ভবে' যিনি মদন ধ্বংসকারী ত্রিপুরারী রুদ্র-শিব তিনিই আবার বাংলার লোকগানে কোচ নারীদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। অর্থাৎ ভারতীয় ঐতিহ্যে তাঁর ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতি পুষ্ট মহিমান্বিত রূপটি যেমন স্বীকৃত, তেমনি লৌকিক গণজীবন তাঁকে পেতে চেয়েছে তাদের একজন প্রতিনিধি হিসেবে। সমগ্র গ্রামবাংলা জুড়েই রয়েছেন অসংখ্য লোকদেবতা। তাঁদের মধ্যে পুরুষ দেবতারা অধিকাংশই সমীভূত হয়েছেন শিবের মধ্যে। কিন্তু স্থানভেদে তাঁদের নাম ও রূপ হয়ে গিয়েছে আলাদা। কোথাও ফসলের কামনায়, কোথাও হিংস্র পশুদের হাত থেকে বাঁচতে কোথাও বা সন্তানের কামনায় মানুষ এই সমস্ত দেবতাদের পুজো করে মানুষ। তাই সমগ্র বাংলা জুড়েই দেখা যায় শিবের অসংখ্য লৌকিক রূপ। সাধারণত ব্রাহ্মণ্য আচার বা পদ্ধতিতে এই সমস্ত রূপের পুজো হয় না। স্থানীয় মানুষরা নিজেদের মত করে পুজো

করে থাকেন। তাই টিনের চালা বা খড়ের ঘরেই এই সমস্ত দেবতার অবস্থান। কোথাও কোথাও স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে পাকা মন্দির। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে শিবের সেই রূপবৈচিত্র্যকেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচনা

...এক...

সন্ন্যাসী ঠাকুর

উত্তরবঙ্গের অন্যতম লোকদেবতা সন্ন্যাসী ঠাকুর যিনি শিবের এক লৌকিক সংস্করণ। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রাধান্য বেশি। সাধারণত শ্বেতবর্ণের মূর্তি। বেশিরভাগ স্থানেই দেবতার বাহন বাঘ অথবা বৃষ। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। গলায় সাপ। মাথায় বিশাল জটা। সাধারণত চৈত্র সংক্রান্তির দিন এই ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা হয়। ফসলের কামনাতেই তাঁর পূজা। অর্থাৎ বাংলার উৎপাদন সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে এই দেবতা। ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোচবিহার জেলার পশ্চিম শিকারপুর গ্রামে কুড়ার পাড় অঞ্চলে বিশাল এক সন্ন্যাসী ঠাকুরের মূর্তি দেখা গিয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রমী বিষয় হল তাঁর বাহন হিসাবে আছে হাতি। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার ১৬২ নং পাটছড়া গোপালপুরে গ্রামে বৃষারূঢ় সন্ন্যাসী ঠাকুর রয়েছেন টিনের ঘরে। স্থানীয় মানুষ সরবালা বর্মনের (বয়স—৩৯) কথায় এখানে কালীপুজোর দিন এই দেবতার পূজা হয় মা কালীর সঙ্গী হিসাবে। স্থানীয় রাজবংশী পুরোহিত পুজো করে থাকেন। মাথাভাঙ্গা মহকুমার কানফাটা গ্রামেও সন্ন্যাসী ঠাকুরের মূর্তি দেখেছি। তাঁর বাহন হিসাবে আছে পাশেই জোড়া হাতি। আর মূর্তির পাশেই রয়েছে পাশেই শিবলিঙ্গ যেটি অবশ্যই দেবতার উৎপাদন শক্তির প্রতীক।

...দুই...

বুড়া ঠাকুর

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় একাধিক গ্রামে স্থানীয় রাজবংশী মানুষের বন্দিত দেবতা বুড়া ঠাকুর। নদীর ধারে বা রাস্তার ধারে কোনো গাছের তলায় তাঁর পূজা করা হয়। বেশিরভাগ স্থানেই তাঁকে লিঙ্গাকৃতি কোনো পাথরে পূজা করা হয়। আসলে শিব হলেন আদিদেব অর্থাৎ প্রাচীনতম দেবতা। সেইদিক থেকে লোকজীবনে তিনিই বুড়া ঠাকুর। রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচতে ও গবাদি পশুর মঙ্গল কামনায় তাঁর পূজা করা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কোচবিহারের রসিকবিল গ্রামে খোলা আকাশের নিচে একটি গাছতলায় বুড়া ঠাকুর একটি লিঙ্গ হিসাবে পূজিত হন। আবার অনেক স্থানে বিশালাকৃতির বাঘছাল পরিহিত সর্পভূষিত শিবমূর্তিও দেখা গিয়েছে। যেমন— গোকুলের কুঠি গ্রামে। আবার বৃষারূঢ় বুড়া ঠাকুরের মূর্তিও পাওয়া যায় শালবাড়ি গ্রামের একটি টিনের চালাঘরে। এটি স্থানীয় ভাষায় 'বুড়ার ধাম' নামে পরিচিত। সাধারণত প্রতি সপ্তাহের মঙ্গল ও শনিবার তাঁর পূজা হয়।

ISSN 0976-9625/**9(2)**, 2022

...তিন...

ত্রিনাথ

অসম ও উত্তরবঙ্গের আর একজন জনপ্রিয় লোকদেবতা হলেন ত্রিনাথ। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় তাঁর পুজো হয়। এই লোকায়ত দেবতা আসলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এই ত্রিদেবের একই শরীরে সমন্বয়িত রূপ। যদিও অনেকেই তাঁকে নাথগুরু আদিনাথ শিব, মীননাথ ও গোরক্ষনাথের সমন্বয়িত রূপ বলে মনে করেন [১]। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে অনেকস্থানেই নাথযোগীরা এই ত্রিনাথের পুজোর আয়োজন করেন। যেমন— কোচবিহার জেলার কচুবন গ্রামে। আবার ক্ষেত্রসমীক্ষায় মাথাভাঙ্গা মহকুমার চেঙ্গারখাতা খাগড়ীবাড়ি গ্রামে টিনের চালাঘরে যেই ত্রিনাথের মূর্তি দেখেছি। তিনি ষড়ভুজ, তিনটি মাথা ও দু'টি পা বিশিষ্ট। বৃষের উপর আরূঢ়। মাথায় জটা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, গলায় তাঁর রুদ্রাক্ষ। তিনটি মুখের একটি সাদা, একটি নীল ও একটি হালকা গোলাপি বর্ণের। পৌরাণিক শিবের তিনটি চোখ। হয়ত সেটিই লোকজীবনে তিনমুখে রূপান্তরিত হয়েছে। স্থানীয় মানুষ নিখিল বর্মন (৩৬) জানান গৃহপালিত পশুর রক্ষার্থে, সন্তান কামনায়, ফসলের কামনায় চৈত্রমাসেই তাঁর পূজা হয়। উত্তরবঙ্গে ত্রিনাথের পুজো উপলক্ষ্যে গান গাওয়া হয় আসরে। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত একটি ত্রিনাথের গানের উল্লেখ করা হল—

"তিন পয়সাতে হয় যার মেলা,
কলিতে তিন নাথের মেলা।
এক পয়সার পান আনি তিন খিলি সাজায়।
গাঁজায় দিয়ে দম বলছে ববম ববম বম ভোলা
সাধুরে ভাই কলিতে তিন নাথের মেলা [২]।"

...চার...

বাবাঠাকুর

উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় দেবতা। এটি লৌকিক শিবের নাম। মূলত সন্তান কামনায় তাঁর পূজা হয়। বাবাঠাকুরকে মূলত গ্রামের অভিভাবক হিসাবেই পূজা করা হয় গ্রামের মঙ্গল কামনায়। বেশিরভাগ স্থানে লিঙ্গেই পুজো করা হয়। কোথাও কোথাও শান্ত ভোলানাথ শিবমূর্তির পূজাও হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কোচবিহার জেলার ভূরকুশ গ্রামে বাবাঠাকুরের যে পুজো হয় সেখানে ত্রিশূল ও কাঠের পাটাতন আছে। মূর্তি নেই। ঐ কাঠের খণ্ডটিকেই পূজা করা হয় শিবরূপেই। চৈত্রসংক্রান্তির সময় আটদিন ধরে তাঁর পুজো করে জমিতে বীজ রোপণ করা হয়। এখানে তাঁর অবস্থান কৃষিদেবতা হিসাবেই। কোচবিহারের রুইয়ের কুঠি গ্রামে শিবলিঙ্গেই বাবাঠাকুরের পূজা হয়।

...পাঁচ...

ডাংধরা দেবতা

উত্তরবঙ্গের অন্যতম লৌকিক দেবতা ডাংধরা দেবতা বা ডাংধরা শিবও বলা হয়। সাধারণত বৃক্ষমূলে গ্রামের থানের নিচে পুজো করা হয়। আবার মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জের অনেক জায়গায় জিগা গাছের মাথায় নিশান বেঁধে এই

দেবতার পুজো হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষাকালীন ভোগডাবরি কেশরিবাড়ি গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি ও রাজবংশী কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পবন বর্মন (৬৮) জানান বছরের যে কোনো সময় এই দেবতার পূজা করা হয় মূলত কাঁচা শস্য ও ছোলা দিয়ে। দেবতাকে নিবেদন করা হয় বেলপাতা। কৃষিকাজে ফসলের কামনায় ও গবাদি পশুদের বাঘের হাত থেকে রক্ষার কামনায় এই পুজো করা হয়।

...ছয়...

বাঘসুর

উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবতা বাঘসুর যাঁর উদ্ভব বাঘের ভয় থেকে। উত্তরবঙ্গের বাঘ বা হাতি ইত্যাদি যেই জন্তুগুলি ভয়ের সঞ্চার করত সেই ভয় থেকে বাঁচতে জন্ম নিয়েছে একাধিক দেবতা। তাঁরা সবাই শিবের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। হয়ত প্রাগার্য জীবনে পশুপতি শিবের সঙ্গে জুড়ে থাকা বহু প্রাচীন টোটেম উপাসনার ফলশ্রুতি হিসাবেই। আবার বাঘসুর নানা রোগের থেকেও মুক্তিদাতা। বোধহয় পৌরাণিক শিবের বৈদ্যনাথ রূপটিই রয়েছে বাঘসুরের এই রোগমুক্তিকারী ক্ষমতার পিছনে। রাজবংশী মানুষরা বাঘসুরকে পাঁঠা ও পায়রা মানত করেন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে কোচবিহারের শালবাড়ি গ্রামে টিনের চালায় একটি শিবমূর্তির পাশেই রয়েছে তাঁরই রূপ এই বাঘসুরের মূর্তি। দেবতা বাঘের উপর আসীন। গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, মাথায় রয়েছে পাগড়ি।

...সাত...

কালসুর

বাঘসুরের মতই আর এক লোকদেবতা কালসুর। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে কালসুরের পূজা হয়। হাতির ভয় থেকেই মূলত এই দেবতার পূজা। শিবরূপেই তাঁকে কল্পনা করা হয়। ইনি হাতির পিঠে আসীন। শালবাড়ি গ্রামে বাঘসুরের পাশেই তাঁর মূর্তি আছে ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গিয়েছে ইনি নানা অশুভ বিষয়ের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করেন। কোচবিহার জেলার উত্তর চেংটিমারি গ্রামে শিবের নানারূপ একসঙ্গে পথের ধারে একটি চালাঘরে পূজিত হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন এই কালসুর। অরণ্যসংকুল উত্তরবঙ্গের বাঘ, হাতি ইত্যাদি হিংস্র পশুর হাত থেকে বাঁচতেই বাঘসুর, কালসুর এই সমস্ত রূপ কল্পিত হয়েছে।

...আট...

গোরক্ষনাথ

গোরক্ষনাথ গবাদি পশু রক্ষার দেবতা। ইনি অনেক স্থানেই শিবের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় এই লৌকিক দেবতার পূজা হয়। মূলত গোসম্পদ রক্ষার জন্যই তাঁর পূজা। তাই গরুর বাচ্চা প্রসবের একুশ দিন পর গৃহস্থ বাড়িতে এই পূজা করা হয়। গরুর দুধের ক্ষীর করে দেবতাকে নিবেদন করা হয়। শিবের সঙ্গে সমীভবনের জন্য ভাং মিশিয়ে দেওয়া হয়। গরুর অসুখ হলে বা গরু হারালেও গৃহস্থগণ গোয়ালঘরের ভিতরে গোরক্ষনাথের পূজা করেন। কোথাও কোথাও মূর্তি তুলে বড় করে বার্ষিক পূজাও করা হয়। যেমন— ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা মহকুমার কাঁঠালবাড়ি গ্রামে ভাদ্রমাসে গোরক্ষনাথের পূজা হয়। গান হয়। এখানেও দেবতাকে গাঁজা, ভাং ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। দেবতা সিংহের পিঠে আসীন। শিবের মতই শ্বেতবর্ণ, মাথায় জটা, লম্বা চুল। এই গ্রামের মানুষকে তিনি সমস্ত অশুভ

ISSN 0976-9625/**9(2)**, 2022

শক্তির হাত থেকে রক্ষা করেন। মনে হয় আর্য এবং অনার্য উভয় সংস্কৃতিতেই শিবের যে পশুপতি রূপ স্বীকৃত যাঁর কাছে গবাদি পশুদের রক্ষার্থে বারবার প্রার্থনা জানানো হয়েছে বেদে বা পুরাণে তাঁরই লোকায়ত রূপ হলেন এই গোরক্ষনাথরূপী শিব। আবার নাথধর্মের প্রভাব উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট। নাথধর্মের অন্যতম যোগগুরু গোরক্ষনাথ। নাথযোগীরা শিবকেই তাঁদের আদিগুরু হিসাবে মনে করেন। নাথঐতিহ্যের সেই দিকটি স্মরণে রেখেই বোধহয় পশুপতি শিব মিশে গিয়েছেন আর এক শৈব যোগী গোরক্ষনাথের সঙ্গে।

...নয়...

মহারাজ ঠাকুর

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দুই দিনাজপুর ও মালদায় 'গ্রামঠাকুর' হিসাবে মহারাজের পূজা করা হয়। ধান চাষ করার আগে অথবা অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটার পরে এই দেবতার পূজা করা হয়। কলকে, গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদি এই দেবতার নৈবেদ্য। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস ইনি উৎপাদন সহায়ক দেবতা। গায়ের রঙ হলুদ, মাথায় মুকুট, সামনে মাহুত এবং রাজকীয় পোশাকে দেবতা কোথাও হাতির পিঠে কোথাও বাঘের পিঠে আসীন। ইনি উর্বরতার দেবতা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেই স্থানে পূজা হয় সেই স্থানের বিখ্যাত রাজার সঙ্গে সাধারণত ইনি সমীভূত হয়ে গিয়েছেন। যেমন— ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার আমবাড়ি ফালাকাটা অঞ্চলের মহারাজ ঠাকুর এক হয়ে গিয়েছেন সেখানকার কোনো এক স্থানীয় রাজা ফালাকাটার সঙ্গে । পাশেই রয়েছে তাঁর ভাই তুলোকাটার মূর্তি। রয়েছে পাশে বাহন বাঘ। রয়েছে দু'জন করে সেপাই, একজন গাঁজা বানানোর চেলা। টিনের চালের ঘরে গ্রামঠাকুর হিসাবেই পূজা হয় ফালাকাটা মহারাজের। নৈবেদ্য হিসাবে নিবেদন করা হয় গাঁজা। মালদা জেলার হরিশচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত অর্জুনাই গ্রামেও ধূমধাম করে মহারাজ ঠাকুরের পুজো হয়। মাহুত সহ হাতির পিঠে বসে থাকেন মহারাজ ঠাকুর। পাশে রয়েছে তাঁর এক অশ্বারোহী সৈন্য। আর মহারাজের দু'পাশে রয়েছে দু'জন লাঠি হাতে পাইক। ফাল্গুন মাসে তিনদিন ধরে পুজো ও মেলা চলে।

...দশ...

ধূমবাবা

জলপাইগুড়ি জেলার দোমহনী স্টেশনের কাছে অবস্থিত কাঁঠালবাড়ি গ্রামে টিনের চালাঘরে পূজিত হন প্রস্তররূপী ধূমবাবা। ধূমবাবা এই অঞ্চলের শিবের লৌকিক রূপ। মূলত গাঁজা নিবেদন করা হয় ও ধোঁয়ায় চারদিক পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বলেই এরকম নাম। কাঁচা জিনিস নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হয়। শিবরাত্রির দিন থেকে তিনদিন ধরে চলে বাৎসরিক পূজা। পূজারী রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরাই। ধূমবাবার মন্দিরে তিনটি লিঙ্গ আছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর হিসাবে তাঁদের পূজা হয়।

...এগারো...

বুড়াবুড়ি

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি গ্রামে এই দেবতার পূজা প্রচলিত আছে। একটি বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার মূর্তি পূজা করা হয় ফসলের কামনাতেই। লৌকিক বুড়ো শিব ও তাঁর সঙ্গিনী হিসাবে গৌরীকে কৃষিসহায়ক দেবতা হিসাবে পূজা করা হয়। শস্যক্ষেত্রের উর্বরতা বিধান ও পুষ্টির জন্য আদিম জনসমাজে প্রধান পুরুষ দেবতা ও মাতৃদেবীর যৌনসম্পর্ক স্থাপন এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এটি এক ধরণের অনুকরণমূলক জাদুবিশ্বাস [৩]। জেমস্ ফ্রেজার তাঁর

'The Golden Bough' বইতে একাধিক উদাহরণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন এই বিষয়টি। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যেও আমরা দেখি শিবের জমিতে ধান পেকে ওঠার আগেই হয়েছে হরগৌরীর বাসর রচনা ও মিলন। বৈশাখে বীজ রোপণের আগে চৈত্র সংক্রান্তিতেও তাই শিব-পার্বতীর বিবাহ দেওয়া হয়, তাদের মিলন কল্পনা করা হয় ভালো ফসলের আশায়। এই মিলন কৃষিক্ষেত্রে উর্বরতা সংক্রান্ত পূর্বোক্ত অনুকরণমূলক জাদুবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত একথা বলাই যায়। আসলে অনুকরণমূলক জাদুবিশ্বাস থেকে কৌমগোষ্ঠীর মানুষ উৎপাদনের দেবতা ও প্রকৃতিদেবীকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেয়, তাঁদের বিবাহ দেয়। কারণ তাঁদের বিশ্বাস এই মিলনেই জন্ম নেবে শস্য। এই চেতনারই সার্থক রূপায়ণ বুড়াবুড়ি ঠাকুর। তাই ফসল কাটার পরেই এই যুগ্মদেবতার পূজা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোচবিহারের ১৮৭ নং খরিজা গোপালপুর গ্রামের বুড়াবুড়ি ঠাকুরের মূর্তি নজরে এসেছে। সেখানে পুজো হয় অগ্রহায়ণ মাসে ফসল তোলার পরে।

...বারো..

মহাকাল

অরণ্যসংকুল উত্তরবঙ্গের আর এক দেবতা মহাকাল। এই অঞ্চলে হাতির উপদ্রব অত্যন্ত বেশি। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলার মানুষ হাতির উপদ্রব থেকে বাঁচতে মহাকালের পূজা করত। নাম থেকেই স্পষ্ট ইনি শিবের এক লৌকিক রূপ। কোথাও কোথাও হাতির সঙ্গে ত্রিশূল সহযোগে দেবতার পূজা হয়। কোথাও বা লিঙ্গেই পূজা হয়। কোচবিহার জেলার সিঙ্গিজানি ভেটাগুড়ি গ্রামে আছে মহাকালধাম। গ্রামের লোক জাগ্রত দেবতা হিসাবেই মহাকালের পূজা করে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা গিয়েছে মহাকাল শুধু হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা করেন না বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকেও রক্ষা করেন। পূজারী হিসাবে আছেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের সতীশচন্দ্র বর্মন। তাঁর কথায় ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশীতে অর্থাৎ শিবরাত্রির দিন এই মহাকাল ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা হয়। আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা মহকুমার হরিনাথপুর গ্রামেও হাতির উপদ্রব থেকে বাঁচতে মহাকালের পূজা হয় লিঙ্গের উপর। চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে বাৎসরিক পূজা হয়।

...তেরো...

বড় কামাৎ ও ছোট কামাৎ

কোচবিহার জেলাতেই এই দেবতার প্রাধান্য। ফসলের কামনায় তাঁর পুজো। ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোচবিহারের ১৮৭ নং খরিজা গোপালপুরে এই দুই দেবতার মূর্তি দেখা গিয়েছে। দেখতে সম্পূর্ণই শিবের মূর্তি। ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত, বৃষারূঢ়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গ্রামের দুই প্রান্তে দু'টি মূর্তি গড়িয়ে পুজো হয়। বার্ষিক পুজো হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে।

...চৌদ্দো...

মাশান

কোচবিহার জেলার জনপ্রিয়তম লোকদেবতা মাশান। মাশানের রূপ ভয়ংকর। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গিয়েছে স্থানবিশেষে মাশানের রূপ আলাদা আলাদা। মাশান অনেক ক্ষেত্রেই শিবের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছেন। স্থানীয় বিশ্বাসে মনে করা হয়, মাশান অর্থ হল শ্মশানবাসী শিব। মূর্তির মুখে আদিম জীবনের ছাপ স্পষ্ট। ক্ষেত্রসমীক্ষায় কোচবিহার শহরে তোর্সা নদীর ধারে টিনের চালায় যেই মাশান মূর্তিটি দেখেছি তাঁর গায়ের রঙ ঘন নীল। ঘাড়ে

ISSN 0976-9625/**9(2)**, 2022

একটি বিশাল গদা। শালবাড়ি গ্রামের নিকটে আছে মুড়িয়া কুমির মাশান । এই মূর্তিটির পরনে আছে শিবের মত ব্যাঘ্রচর্ম। কিন্তু মূর্তিটি ভয়ংকর। মাথা নেই। ধড়ের উপরেই রয়েছে চোখ। দেওয়ান হাটের শিশুবগুড়ি অঞ্চলের মাশানের গায়ের রঙ গাঢ় নীল। শিবরাত্রির দিন তাঁর পুজো হয়। তবে এই জেলার সবথেকে বিখ্যাত মাশান মন্দিরটি আলোকঝারি গ্রামে অবস্থিত। এখানে পাকা মন্দির আছে। বিশাল আকৃতির মূর্তি। বাহন তাঁর শোল মাছ, হাতে আছে গদা। তবে এখানে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। পূজারী মিঠুন চক্রবর্তী জানান শিবমন্ত্রে দেবতার পূজা হয়, ধ্যান হয়। বৈশাখের সংক্রান্তিতে পুজো হয়। শুয়োর, পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। শিকারপুর কুড়ারপার গ্রামে সন্ন্যাসী শিবের পাশেই আছে মাশান ঠাকুর। তাঁর গাত্রবর্ণ কালো। হাতে মুগুর জাতীয় অস্ত্র। পরনে বাঘছাল। মুখে বীভৎসতা স্পষ্ট। পাশেই আছে বাহন হাতি। সাধারণত দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতেই এই দেবতার পূজা হয়। এছাড়া কোনো অপশক্তির নজর থেকে বাঁচতেও মাশানের পুজো হয়। মাশানের বাহন বাঘ, হাতি, শোল মাছ।

সিদ্ধান্ত

ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে এখানে উত্তরবঙ্গে শিবের নানা লৌকিক রূপের বৈচিত্র্য দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু শুধু উত্তরবঙ্গে নয় সারা বাংলা জুড়ে রয়েছে শিবের নানা বৈচিত্র্যময় লৌকিক রূপ। যেমন— দুই চব্বিশ পরগণায় রয়েছেন পঞ্চানন্দ ঠাকুর, মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় রয়েছেন আটেশ্বর, মুর্শিদাবাদে রয়েছেন ভৈরব বাবা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বাবা বড় কাছারি ইত্যাদি। সারা দেশের নানা স্থানেই ছড়িয়ে রয়েছে শিবের নানা লৌকিক রূপ। শিবের আর এক লৌকিক রূপ দেখেছি উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ার কাছে চিতাই গ্রামে। স্থানীয় নাম গোলু দেবতা। ইনি কুমায়ুন অঞ্চলের ন্যায়দানকারী দেবতা হিসাবেই পরিচিত। শিবের অবতার বলা হয় তাঁকে। মানুষ তাদের যাবতীয় অভাব বা কষ্টের কথা, জীবনের সমস্যার কথা চিঠি লিখে জানান গোলু দেবতাকে। পরে সেই সমস্যা মিটে গেলে মন্দিরে ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে যান। শিবের আর এক লৌকিক রূপ হিমাচল প্রদেশের গদ্দি উপজাতির মধ্যে ‘গুঙ্গা’। গৃহপালিত পশুর রক্ষাকর্তা হিসাবে তারা পূজা করে শিবেরই এই লৌকিক সংস্করণকে। আসলে প্রাগার্য ভারতবর্ষে সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য গণদেবতার সমন্বয় হয়েছিল পৌরাণিক শিবের মধ্যে। সেই ধারা অব্যাহত থাকল যুগ যুগ ধরে। গ্রামজীবনের লোকদেবতারা, গণদেবতারা তাই মিশে গেলেন শিবচেতনার সঙ্গে। লোকজীবনে শিব স্থান পেলেন নানা রূপে।

তথ্যসূত্র

[১] ড. দিলীপকুমার দে, ‘কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, অণিমা প্রকাশনী, জানুয়ারি, পৃষ্ঠা-৯০, (২০০০)।

[২] ব্যক্তিগত সংগ্রহ, হরিনাথ বর্মন (৩৭), চেঙ্গারখাতা খাগড়িবাড়ি, কোচবিহার।

[৩] মাধুরী সরকার, ‘ব্রত : সমাজ ও সংস্কৃতি’, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, সেপ্টেম্বর, পৃষ্ঠা-৪২, (২০১৯)।

Review Article

Memory, History and the land in Transition: A post- Colonial Perspective in Salman Rushdie's "Midnight's Children"

Ambarish Sen

Assistant Professor of English, Barasat Government College.
Email : ambarish.sen@bgc.ac.in

Received: 4th July 2022 Revised: 11th August 2022 Accepted: 12th August 2022

Abstract: Salman Rushdie is a pioneering voice and a page setter in the field of post-colonial Indo-Anglian fiction, as well as the novels of Indian Diaspora. His novels since nineteen eighties introduced a new way of looking into the history of the sub continent and review post-colonial history from the perspectives of the marginals. His works including the "*Midnight's Children*" and "*Imaginary Homelands'*, brings into foreground various complex issues and unexplored trends of socio-political history of India since the partition of 1947. In the "*Midnight's Children*" he constructs the narrative in a pattern of juxtaposition of his personal life history and the history of the new born nation. The question of fragmented identity of his protagonist and the progress of the nation through a tumultuous socio-political upheaval, becomes the central point of exploration and debate in his "*Midnight's Children*". This article seeks to analyze Rushdie's complex exploration and pre-occupation with the mysterious bond between the life of the protagonist and that of the nation. The article also attempts to foreground the narrative parallel between the life of the protagonist and the land in transition. It emphasizes the authors concern with " tyranny of history and time".

Keywords: Postcolonial identity, Marginality, Transition, Diaspora, History, Partition.

Introduction

Salman Rushdie's *Midnight's Children* is a revolutionary milestone in the contemporary Indo-Anglican fiction and the fictions of Indian Diaspora. With the publication of *Midnight's Children*(1981) Indian English fiction achieved a new impetus and a fresh dimension as the novel signals a clear sign of emancipation of Indian English novels from the traditional theme and subject matter.

Discussion

In *Midnight's Children* the author invents an ingeniously complex narrative pattern with the help of modern western fictional techniques like *magic realism* of Gabriel Garcia Marques, Gunter Grass and others. The novel thus becomes a trend setter for the contemporary postcolonial Indian writing in English. The book is read as an allegory of Indian national history or a fictionalized presentation of the nation's story from a subaltern perspective. Through the personal life history of Saleem Sinai, the author's spokesman, Rushdie dramatizes the history of Indian subcontinent encompassing the turbulent time of pre independence, birth of the nation and the growth and maturation of the new nation from 1947 to the time of Emergency.

Saleem's version of history clearly establishes a symbolic connection with the history of the nation as the two develops simultaneously. Saleem's personalized impression to the major shifts in national history and his ambiguous response to its decisive events constitute an alternative rendering beyond the established historical scholarship. Thus Saleem Sinai and his sensitive response to the colonial/postcolonial history of the nation unlocks very many dark unheeded chambers of our national history that accounts for his retailing history from below and reviewing the trends from the margin. Thus the *Midnight's Children* is an exemplary text in the rich gallery of post modern fiction not only for Rushdie's innovative narrative technique, but also for his sincere attempt to constitute a parallel historical counter discourse, rendered vibrant and intensely humane through the personal receptivity of his extraordinarily gifted protagonist.

The problem of identity in the case of Saleem as well as of India which is hinted at in the very beginning of the novel, constitutes Rushdie's major thematic debate in the novel. The symbolic as well as metaphorical connection between the problematic identity of Saleem as well as of the nation strengthens the psycho-social bond between the nation and the greatest of the midnight's children. The course of events in Saleem's life epitomizes the achievements and failure of the new born nation in the process of its becoming a modern welfare nation state.

The story of Saleem Sinai is symbolically and metaphorically linked to the history of Indian subcontinent. The symbolic connection between the two is established from the very beginning of the novel that enables Rushdie as well as his protagonist to provide the narrative with a steady pace and a sustained tempo. Saleem himself opens his account by saying:

> I had been mysteriously handcuffed to history, my destinies indissolubly chained to those of my country. For the next three decades, there was to be no escape. (P.3)

The indication is clear from this revelatory statement as to which direction the course of the narrative is going to take. With his instinctive inner power Saleem realizes that for him, history is paradoxically a tyrannical chain of slavery and a redemptive passport to freedom. Saleem is not an ordinary child but a baby with certain extraordinary endowments. The moment of his birth is also significantly linked to the birth of free India that is exactly the 12 O'clock of the midnight of 14 – 15th August 1947. The metaphor of the birth of new India as well as of Saleem Sinai at the Narlikar's Nursing Home of Bombay becomes more powerful

from the title *Midnight's Children* that suggests the birth of a human being after the trauma of labour pain and the birth of a nation from the tumultuous gorge of nocturnal darkness of history. Saleem says-

> I was born in Doctor Narlikar's Nursing Home on August 15th, 1947. And the time? The time matters, too. Well then: at night. No, it's important to be more…On the stroke of midnight, as a matter of fact. Clock-hands joined palms in respectful greeting as I came. Oh, spell it out, spell it out: at the precise instant of India's arrival at independence, I tumbled forth into the world. (P.3)

Saleem's narrative account of the growth of Indian history after the much debated independence, is often considered by commentators as 'a subaltern representation of history'. For instance Gayatri Chakroborty Spivak in one of her famous essay put forward the sensitizing questions 'can the subaltern speak? [in Rushdie's *Midnight's Children*]'. The answer is obviously ambiguous – simultaneously yes and no.

Saleem's fragmented identity and hybridity adds to his narrative another complexity that remains unresolved till the end of his life as well as the narrative. It links his fate more powerfully to the destiny of the subcontinent, for the latter, also encounters similar crisis of fragmented identity and hybridity due to the stigma of partition that bifurcates the subcontinent geographically, culturally as well as historically. Saleem, though an endowed midnight child, born on the auspicious moment of the birth of free India (at 12'o clock 14th August,1947) has to face the similar disastrous obliteration like millions of unidentified marginals who are swept aside by upheavals in the life of nation. Saleem had to face serious psychophysical set back through a series of misfortunes that brought him down into a life in death existence. It is perhaps the worst tragic irony in the novel that the child whose birth was a welcome event by the then political thinkers like Nehru, ends up becoming a ruined soul and nameless marginal, the 'Buddha' in disgust and disillusionment. From this point of view Saleem's account is obviously the subterranean version of 'history from the margin'. Saleem's role in the novel is that of the omniscient narrator and the prime mover of the action. In Saleem's complex thread of the narrative, time past and time present are juxtaposed and his story shifts backward and forward in movement.

The central story line goes as follows : Born at the stroke of midnight on the day of India's independence, the life of Saleem Sinai is permanently handcuffed to the history of his nation. Narrated by a thirty year old Saleem to his partner and colleague Padma, *Midnight's*

Children charts the story of his life throughout the tumultuous history of India's journey to independence and partition and beyond.

As mention earlier, Saleem was not only linked to the troubled period of history, but also was born with extraordinary endowment and sensitivity. The greatest irony of the narrative lies in the fact that Saleem's hidden talents and instincts becomes powerfully assertive when he lost his memory by an unfortunate accident. While articulating the narrative, Saleem intermingles the events from the documented national history and his imaginative account of certain incidents that cut across his life. Starting with his grandfather's return to the Kashmir region of India in 1915, Saleem counts down the history of his family and of his nation, migrating across time and across India until the story converges on the moment of his birth in Dr Narlikar's Nursing Home in Bombay on 15 August 1947. Heralded by prophecies and the press as the chosen child of midnight, Saleem, already overwhelmed by the expectations laid on him, discovers he is imbued with the special power of telepathy, and is able to connect with each child born in the midnight hour of 15 August 1947. Using these powers to converse with the other children, each in possession of their own supernatural powers, Saleem develops the Midnight Children's Conference, through which we see many of the problems faced by the growing Indian nation.

The cultural, linguistic, religious and political differences faced by such a vastly diverse nation are shared by the 1,001 children of the midnight hour; most notably Saleem whose every action seems to alter the course of Indian history and development. As a young child he encounters the language riots, sparking their future war cry with a childish song he sings to marchers. Later he is present as his uncle General Zulfikar arranges the 1958 coup against the Pakistani government and ushers in a period of martial law across the country.

Endowed with this special telepathic power, Salim arranges the Midnight Conferences with other midnight's children, where they discuss various crisis and challenges that the new born nation was confronting. This instinctive power of feeling and telepathic communication, become at once a way of redemption and a tyranny of oppression for Saleem.

Thus Saleem, in his attempt of constructing a counternarrative of history, often relies on his memory, which fades in and fades out at regular interval. Hence, Saleem's story is sometimes fabricated and told from his personal point of view. The protagonist articulates the complex journey of the nation, through different phases of socio-political turmoil, from Partition to the troubled period of Emergency. Saleem's narrative comes to an abrupt end, as

his short yet eventful journey ends all on a sudden. As the country encounters another turbulent period in her journey, Saleem's symbolic role as a choric commentator ceases.

Conclusion

To conclude, Rushdie constructs his narrative in such a way, that the interlinked account of Saleem and the Nation is harmoniously and artistically juxtaposed. Saleem gets back his additional endowment at various critical turn of events in his life, and the account of the country. To conclude, Rushdie's Midnight's Children, marks a decisive transformation in the vast genre of the Indian Diasporic writing. It remains an exemplary text, that heralds the subsequent works of the area into a renaissant dawn, with its nuanced narrative pattern, superb artistic interweaving of realism and imagination, personal and the national saga at large. Saleem's rendering of the historical counter-discourse from the context of marginals, makes the text a fascinating and multilayered text with a variety of interpretative possibilities.

Bibliography

[1] S. Rushdie : "*Midnight's Children"*. Vintage, London (1995).

[2] P. Kaushik: "*History in the novels of Salman Rushdie".* Kala Prakashan, Varanasi (2009).

[3] D. Smale: "*Salman Rushdie Midnight's Children The Satanic Verses"*. Palgrave Macmillan, New York (2001).

[4] U. Parameswaran: "*Salman Rushdie's Early Fiction"*. Rawat Publications, New Delhi (2007).

[5] S. Rushdie Salman, *Critical Essays.* Edited by Mohit K. Ray, Rama Kundu, vol-I, Atlantic, Delhi (2006).

Research Article

An assessment of socioeconomic vulnerability in a few selected villages in Sundarban, India by Artificial Neural Network

Semanti Das[1], Chandan Surabhi Das[2*]

[1]Assistant Professor in Geography, Chandrakona Vidyasagar Mahavidyalaya, Paschim Medinipur, West Bengal, India and Research Scholar in the Dept. of Geography, West Bengal State University, West Bengal, India
[2] Associate Professor in Geography (WBES), Barasat Government College, West Bengal, India
*Corresponding author email: yenisi2002@gmail.com

Received: 7th April 2022 Revised :10th June 2022 Accepted: 11th June2022

Abstract: The Indian Sundarbans are an endangered ecosystem with a specific bio geographical composition that is vulnerable to natural disasters. The goal of this study was to assess the existing socioeconomic vulnerability of the rural population and to identify the important elements that enhance the degree of vulnerability and validate them using an Artificial Neural Network (ANN) prediction model in some selected villages with 160 households in the Gosaba Block. The present research employed an integrated vulnerability method, which combines socioeconomic and biophysical aspects. The exposure, adaptive capacity, and sensitivity index were calculated. Based on this criteria, 156 households (97.5%) had an extremely high vulnerability score, whereas 4 households (2.5%) had a moderate vulnerability rating. Income generation sources from remittances, Proximity of market, Age of the respondent, Family size, Building social network, Storm surges, Subsidiary sources of household income Dwelling years, Increased temperature, Embankment breaching and status of earning are all significant predictors of socioeconomic vulnerability. As a result, a policy initiative should focus on improving existing social and financial capital, ensuring easy access to local government, and encouraging community-based activities.

Keywords: Vulnerability, exposure, adaptive capacity, sensitivity, Artificial Neural Network (ANN)

Introduction

The anticipated repercussions of climate change and its effects are projected to have significant ramifications on both communities and economies (Ajani, et al., 2013) [1]. The susceptibility of households, especially in rural communities, is significantly affected by the existing climate shocks and strains (Manandhar et al., 2011; Shah et al., 2013; Sujakhu, 2018)[2-4]. Vulnerability arises from the interplay of biophysical causes, including climate exposure, and the sensitivity and adaptive capability of the system (Shah et al., 2013)[3]. The susceptibility of rural households is attributed to a mix of economic, environmental, and social factors, in addition to their exposure to climate extremes and gradual changes in climatic circumstances (Nelson 2011; Goodrich et al., 2017)[5-6]. Artificial neural networks

(ANNs) can also recognize complex patterns in data sets that computational formulas cannot (Vicente et al., 2011; Aradag et al., 2017; Taormina et al., 2015; Hajihassani et al., 2015; Chau, 2007) [7-11]. Our study aimed to precisely assess the existing socioeconomic vulnerability of the rural population, with a focus on the impact of environmental, economic, and social variables such as exposure, sensitivity, and adaptive capacity on the degree of vulnerability at the local level in specific villages of the Gosaba Block. The primary objective of this paper is to clarify the key factors that amplify the level of vulnerability through the utilization of an Artificial Neural Network (ANN) prediction model. Additionally, we sought to validate this assessment using ANN, which will enable fruitful discussions among researchers, local governments, and stakeholders. Ultimately, this will contribute to more comprehensive assessments and the development of effective adaptation strategies.

Specific Problem to study

The Indian Sundarbans are located in the province of West Bengal along the eastern coast of India. The region's mean elevation is considerably low, with the islands typically measuring 3–8 meters in height and being completely submerged in tidal surges (Hazra et al. 2002)[12]. The fundamental groundwork for developing the required abilities and policies for climate-resilient development has been established at the national level, there is still a lack of comprehensive studies and scientific input on the impacts and vulnerability of climate change, particularly at the local level. Local governments and communities play a crucial role in adapting to climate change by organizing strategies to address local effects, facilitating communication between individual and communal efforts to reduce susceptibility, and overseeing the distribution of resources to support adaptation (Agrawal, 2010)[13].We selected the villages of Gosaba Block as our study area due to their geographical location **(Figure 1)**.

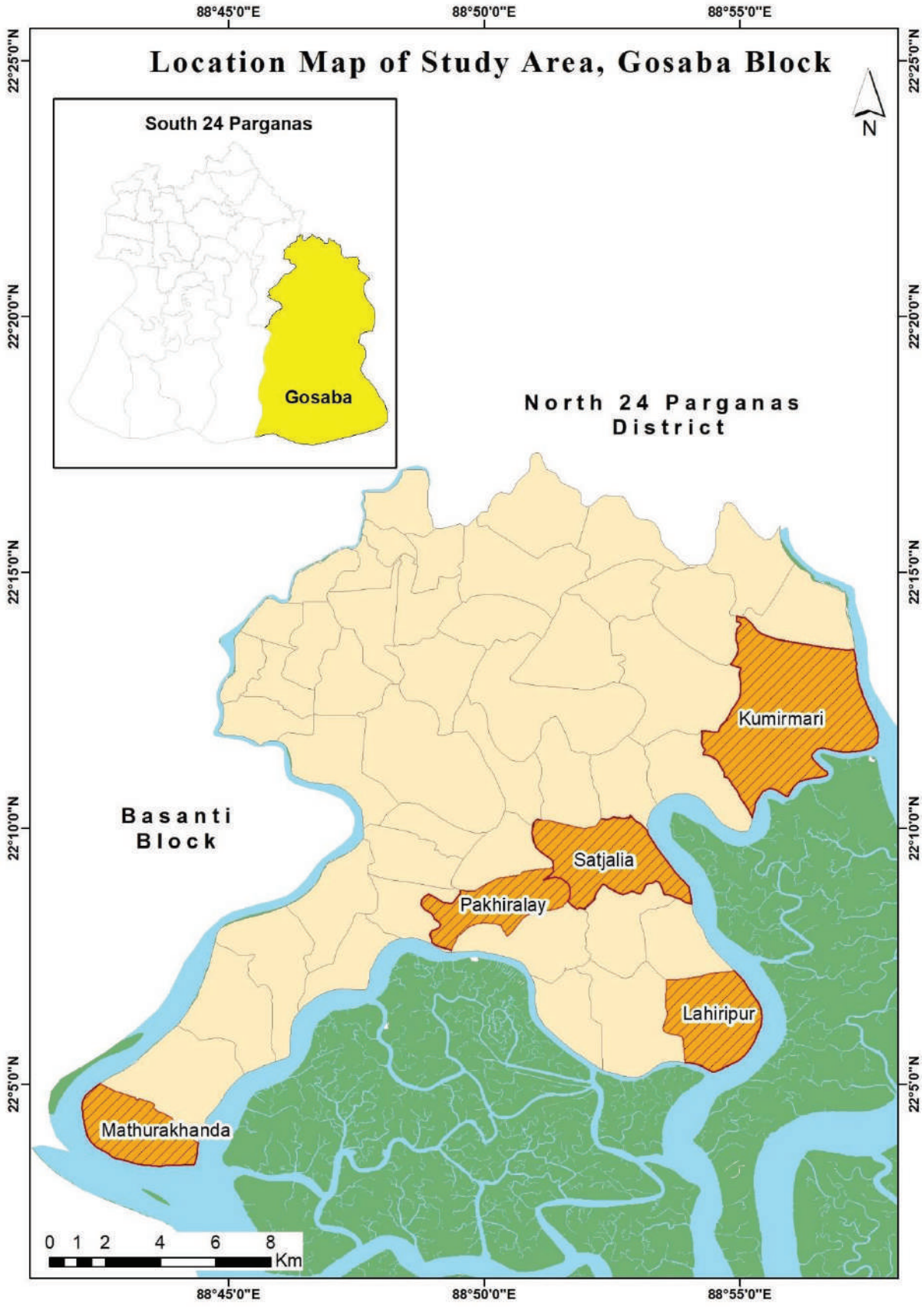

Fig.1 Location Map of Study Area,Gosaba Block

 ISSN 0976-9625/**9(2)**, 2022

Methodology

The present study employs a descriptive-analytic approach and utilizes survey data acquired from households residing within the designated study area. In the very initial phase of village selection in the Gosaba Block, multistage cluster sampling was implemented. At first, the Block's GPs were divided into two strata: adjacent to the forest perimeter and connected to the mainland. Villages were selected from each of these strata using a simple random sampling lottery method. Our sample households (n=160) were drawn from the villages of Mathurakhand (n=22), Pakhiralay (n=39), Satjelia (n=38), Lahiripur (n=28), Kumirmari (n=33).

The Overall Vulnerability Index

We investigated socioeconomic vulnerability in some selected villages of Gosaba Block utilizing its major components and site-specific sub-indicators in this study. Major variables, namely environment, economic, and social were used to examine the degree of exposure, adaptive capacity and sensitivity. A technique for generating composite indices using Principal components analysis (PCA) is to apply the "eigenvalue-greater-than-one" rule, as given by Kaiser (Kaiser, 1960)[14].Exposure,Adaptive capacity, Sensitivity Index were formulated by weightage of each indicator initial eigenvalues with percentage of variance. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2012)[15] developed the vulnerability index, which is defined as the overall result of adaptation capability (socio-economic) and sensitivity/exposure (biophysical):

Vulnerability = (Adaptive capacity) – (Sensitivity+ Exposure)……Equation 1

A household is less susceptible to the effects of climate change when its adaptive capacity outweighs its sensitivity and exposure, and vice versa. Exposure and sensitivity were both given negative values for determining the direction of association, or sign, of vulnerability indicators. The rationale is that, assuming continuous adaptive capacity, households with high exposure to climate shocks are more vulnerable to damage. It follows that lower vulnerability is indicated by a greater net value and vice versa. Based on the value of their vulnerability index, each individual household in this case was assigned a category: (1) highly vulnerable, indicating that the difference between sensitivity/exposure and adaptive capacity is significant negative; (2) moderately vulnerable, indicating that the difference between sensitivity/exposure and adaptive capacity is almost zero.

Artificial Neural Network (ANN)

The IBM SPSS 26 version was applied to test the accuracy of the multilayer perceptron (MLP) neural network functions. As an experiment, the different partition rates of the dataset were randomly assigned for training, testing, and holdout such as ANN1 = 70%–30%–0%, ANN2 =80%–20%–0%, ANN3 = 60%–40%–0%, and for model building and to find out the weight training dataset has been used. Testing data is utilized to prevent overtraining during training mode and to identify errors. The model is validated using the holdout data. To perform training, all covariates were normalized using the formula (xmin)/(maxmin), whose values should be between 0 and 1, and only data from the training set was used. Variables used to build the ANN are based on exposure, adaptive capacity and sensitivity components along with associated variables of Gosaba block (**Table 1**).

Table 1
Variables used for Computing Vulnerability Index and ANN

Variable's code	**Description of Measurement**
Exposure component	nature and extent of local environmental change for the last 10 to 20 years, nature and extent of local environmental change for the last 10 to 20 years affecting livelihoods (measured on a scale of 1-7), potential environmental threats (frequent cyclones, storm surges, heavy rainfall, coastal erosion, riverbank erosion, embankment breaching, and increased temperature) in our community (1 as the least serious threat to 6 as the most serious threat).
Variable Environment	
Adaptive capacity Component	Main and Subsidiary sources of household income, distance to markets (absolute distance), income generation from remittances, profit generation from agriculture and livestock (on a scale of 1-7 building a social network to maintain the social safety net to fight against the environment, the nature of trust in neighbours (on a scale of 1-7).
Variable Economic	
Sensitivity Component	Sex, age of the respondent, experiences of living in the area, number of family members (male and female), number of dependent members on earning members, power, water security and stability and sanitation in the locality (on a scale of 1-7).
Variable Social	

Source: Computed by Authors

New Insights or Views

The present research attempted to assess socioeconomic vulnerability in five villages in Gosaba Block. A field-based micro-level study helps us better comprehend the complexities of socioeconomic vulnerability. A village-level vulnerability assessment also provides the local government with information about place-based needs and priorities, allowing them to make location-specific decisions. Overall, settlements in the Indian Sundarbans remain vulnerable in terms of basic infrastructure. In this circumstance, any climate extremes will increase their susceptibility, perhaps resulting in the loss of livelihoods, properties, and even lives. To increase resilience, individuals should implement various tactics. To increase people's adaption, the welfare of the residents should be prioritized (Biswas and Nautiyal,2020) [16]. Social capital has been shown to play a crucial role in adaptation (Le 2019) [17].

Results and Discussion

The Overall Vulnerability Index

The aggregate vulnerability index was calculated by adding the composite vulnerability sub-indices for exposure, sensitivity, and adaptive capacity (Equation 1).Based on this methodology, 156 households (97.5%) exhibited an extremely high vulnerability index, whereas 4(2.5%) households demonstrated a moderate vulnerability index **(Figure 2).** The vulnerability analysis methods suggested by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2012 identified Mathurakhand, Pakhiralay, Satjelia, Lahiripur, and Kumirmari villages in Gosaba block as needing urgent attention to reduce vulnerability levels. These villages have shown a significant level of vulnerability and sensitivity with minimal adaptability. The sensitivity domain comprises social variables. Societies with an aging population, larger families, and fewer years of residency are at the biggest risk in the stratification of a socio-ecological system. Increased family size or a larger number of individuals from dependent populations can strain the resources allocated per person. The average household size in all villages varies from four to six individuals, showing minimal variation between the five villages. Adaptive capacity and vulnerability have an inverse relationship.

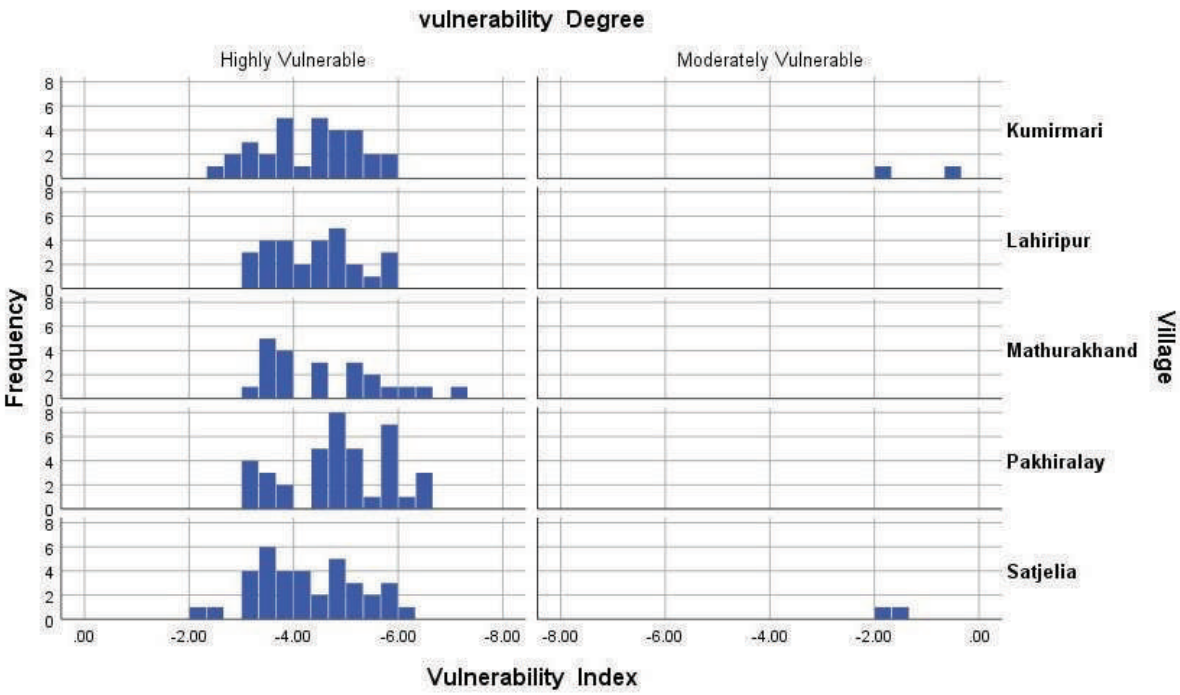

Figure 2 Selected Villagewise Vulnerability Index of Gosaba Block

Artificial Neural Network (ANN)

The primary objective of this study was to assess the predictive capabilities of a Multi-Layer Perceptron (MLP) neural network in determining the influence of environmental, economic and social variables of the components exposure, sensitivity and adaptive capacity on the degree of vulnerability. The summary for the designed models provides information regarding the training (and testing) and holdout samples. During the training phase, the neural network minimizes its error function. The **ANN3** model was found to have the lowest cross-entropy error (.008), indicating the model's ability to predict the influence of exposure, sensitivity and adaptive capacity on the degree of vulnerability. According to the research findings, the ANN3 model generated 0% of erroneous forecasts on the training and testing samples, respectively. The training procedure was carried out until one consecutive step occurred in which the error function did not decrease.

Table 2 shows the importance of independent factors in the ANN3 model. Income from remittances has the biggest impact on the MLP neural network's ability to predict the vulnerability level. Other important factors include market proximity, respondent's

age, family size, social network development, storm surges, supplementary household income sources, duration of residence, rising temperatures, breach of embankments, and income status.

Table 2

Independent variable importance

Variables	ANN1 70%-30%-0%		ANN2 80%-20%-0%		**ANN3 60%-40%-0%**	
	Importance	Normalized Importance	Importance	Normalized Importance	**Importance**	**Normalized Importance**
Income from remittances	0.037	63.0%	0.064	100.0%	**0.063**	**100.0%**
Proximity to markets	0.040	68.2%	0.061	95.2%	**0.056**	**89.4%**
Age	0.051	86.6%	0.055	86.1%	**0.055**	**87.1%**
Family size	0.040	67.8%	0.048	75.9%	**0.052**	**83.4%**
Building social network	0.042	70.6%	0.042	67.2%	**0.052**	**83.3%**
Storm surges	0.050	83.9%	0.045	71.4%	**0.051**	**80.5%**
Subsidiary sources of household income	0.036	60.4%	0.030	47.3%	**0.050**	**80.0%**
Dwelling years	0.059	100%	0.057	89.7%	**0.049**	**78.3%**
Increased Temperature	0.047	79.4%	0.035	54.5%	**0.049**	**77.8%**
Embankment breaching	0.046	78.2%	0.048	76.2%	**0.048**	**75.9%**
Status of Earning	0.050	84.7%	0.040	62.9%	**0.044**	**70.8%**
Heavy Rainfall	0.045	76.2%	0.032	50.3%	**0.040**	**63.8%**
Environmental changes affecting livelihoods	0.046	77.1%	0.040	63.0%	**0.040**	**63.0%**
Frequent cyclone	0.046	78.2%	0.038	60.4%	**0.038**	**61.1%**
Profit from Agriculture and Livestock	0.039	66.5%	0.034	53.3%	**0.038**	**60.6%**
Trust in Neighbours	0.040	67.3%	0.044	68.7%	**0.037**	**59.2%**
Local environmental Change	0.033	55.5%	0.029	45.5%	**0.037**	**58.4%**
Water and sanitation security	0.044	73.6%	0.050	78.8%	**0.034**	**54.6%**
Electric/Power security	0.047	78.6%	0.043	67.3%	**0.034**	**54.0%**
Main source of household income	0.052	87.0%	0.040	63.4%	**0.033**	**52.2%**
Riverbank erosion	0.042	70.9%	0.037	57.9%	**0.029**	**46.1%**
Number of dependent members on earning members	0.027	45.1%	0.037	58.6%	**0.028**	**44.0%**
Coastal erosion	0.029	49.4%	0.036	57.2%	**0.025**	**40.1%**
Gender/Sex	0.011	19.2%	0.014	22.1%	**0.019**	**29.5%**

Source: Computed by Authors

Conclusion

A village-level vulnerability assessment clearly highlights the socio-economic pressures and requirements. Risk assessment should be applied to the entire Indian Sundarbans region. Local governments should prioritize villages with higher risk scores. It is crucial to recognize the unique requirements of the intricate socio-ecological system of the Indian Sundarbans at the national level. Separate action plans are necessary for these regions when formulating national policies related to disaster management, social welfare, or

resource management. The national government should ensure proper decentralization of governance to empower local governments to address their own objectives. More investigation is needed to gain a deeper understanding of the actions done and to provide more sustainable alternatives. Vulnerability levels fluctuate over time (McLaughlin et al. 2002; Blaikie et al. 2005) [18-19]. Therefore, conducting comprehensive long-term research of a certain location is necessary to determine its vulnerability more accurately.

Acknowledgements

The authors would like to thank all the villagers for offering their best support for data collection and assistance during field survey. We express gratitude to the authors of various Government reports, which have been generously used in the preparation of this paper.

References

[1] E. N. Ajani, R. N. Mgbenka, M. N. Okeke: Use of indigenous knowledge as a strategy for climate change Adaptation among Farmers in sub-Saharan Africa: Implications for policy. *Asian J. Agric. Ext. Econ. Sociol*.2, 23–40(2013).

[2] S. Manandhar, D. S. Vogt, S. R. Perret, F. Kazama: Adapting cropping systems to climate change in Nepal: A cross-regional study of farmers' perception and practices. *Reg. Environ. Chang.***11**, 335-348(2011).

[3] K. U. Shah, H. B. Dulal, C. Johnson, A. Baptiste: Understanding livelihood vulnerability to climate change:Applying the livelihood vulnerability index in Trinidad and Tobago. *Geoforum*.**47**,125-137(2013).

[4] N. M. Sujakhu, S. Ranjitkar, R. R Niraula, M. A. Salim, A. Nizami, D. Schmidt-Vogt, J.Xu: Determinants of livelihood vulnerability in farming communities in two sites in the Asian Highlands. *Water Int.* **43**,165–182 (2018).

[5] V. Nelson: Gender, Generations, Social Protection and Climate Change: A Thematic Review; *Overseas Development Institute, ODI: London, UK.* 171 (2011).

[6] C. G. Goodrich, M. Mehta, S. Bisht: Status of Gender, Vulnerabilities and Adaptation to Climate Change in the Hindu Kush Himalayan: Impacts and Implications for Livelihoods, and Sustainable Mountain Development. *Integrated Centre for Mountain Development (ICIMOD): Kathmandu, Nepal*, (2017).

[7] R. Vicente, S. Parodi, S. Lagomarsino, H. Varum, J. M. Silva, Seismic vulnerability and risk assessment: Case study of the historic city centre of Coimbra, Portugal. *Bull. Earthq. Eng.* **9**, 1067–1096 (2011).

[8] S. Aradag, Y. Genc, C. Turk: Comparative gasketed plate heat exchanger performance prediction with computations, experiments, correlations and artificial neural network estimations. *Eng. Appl. Comput.FluidMech.* **11**, 467–482 (2017).

[9] R. Taormina, K.W. Chau, B.Sivakumar: Neural network river forecasting through baseflow separation and binary-coded swarm optimization. *J. Hydrol.***529**, 1788–1797 (2015).

[10] M. Hajihassani, D. J. Armaghani, A. Marto, E.T. Mohamad: Ground vibration prediction in quarry blasting through an artificial neural network optimized by imperialist competitive algorithm. *Bull. Eng. Geol. Environ.* **74**, 873–886(2015).

[11] K. W. Chau: Reliability and performance-based design by artificial neural network. *Adv. Eng. Softw.* **38**, 145–149 (2007).

[12] S. Hazra, T. Ghosh, R. DasGupta, S. Sen: Sea level and associated changes in the Sundarbans. *Science and Culture*. **68 (9/12**), 309–321(2002).

[13] A. Agrawal: Local institutions and adaptation to climate change. In Social Dimensions of Climate Change: Equity and Vulnerability in a Warming World. *R. Mearns. Ed: The World Bank: Washington, DC, USA*.173–198(2010).

[14] H. F. Kaiser: The application of electronic computers to factor analysis. *Educ. Psychol. Meas.* **20**, 141–151(1960).

[15] Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC: Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation. *A special report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press*.(2012).

[16] S. Biswas, S. Nautiyal: An assessment of socio-economic vulnerability at the household level: a study on villages of the Indian Sundarbans. *Environment, Development and Sustainability*.(2020). https://doi.org/10.1007/s10668-020-01085-2.

[17] T. D. N. Le: Climate change adaptation in coastal cities of developing countries: Characterizing types of vulnerability and adaptation options. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*.(2019).https://doi.org/10.1007/s1102 7-019-09888-z.

[18] S. McLaughlin, J. McKenna, J.A.G. Cooper: Socio-economic data in coastal vulnerability indices: Constraints and opportunities. *Journal of Coastal Research,* **36**(sp1), 487–498(2002).

[19] P. Blaikie, T. Cannon, I. Davis, B. Wisner: At risk: Natural hazards, people's vulnerability and Disasters. *Routledge, London and New York*.(2005).

Research Article

উনিশ শতকের বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার অবসরযাপন

উর্মিতা রায়

সহযোগী অধ্যাপক, বারাসত সরকারী কলেজ

ই-মেইল : urmitaray@gmail.com

Received: 2nd March 2022 Revised: 8th September 2022 Accepted: 9th September2022

সারসংক্ষেপঃ প্রবন্ধটিতে উনিশ শতকের বাংলায় মেয়েদের অবসর যাপন এবং চিত্ত বিনোদন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মেয়েদের অবসর যাপনের ক্ষেত্রে ঘটা পরিবর্তনগুলি এবং উনিশ শতকে নব নারী / ভদ্রমহিলা নির্মানকল্পে মেয়েদের রুচির পরিবর্তন ও সেই মর্মে অবসর যাপন ও চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের প্রকৃতি নির্নয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচকশব্দ: অবসর যাপন, বিনোদন,সংস্কার আন্দোলন,ভদ্র মহিলা,আত্মজীবনী, গান, যাত্রা, উপন্যাস

ভূমিকা

মেয়েদের অবসর নিয়ে ধারণা করার ক্ষেত্রে সমস্যা হল, তাদের পৃথক কোন কর্মক্ষেত্র নেই, গৃহ এবং পরিবারই তাদের কর্মক্ষত্র। ফলে তাদের কাজের নির্দিষ্ট কোন সময়ও নেই। সমাজ পরুষতান্ত্রিক বলে কাজ সম্পর্কে ধারণা করা হয় পুরুষের কাজের নিরিখে। গৃহকাজকে তাই কাজ বলে চিহ্নিত করতে সমস্যা হয়। এদিকে সমকালীণ মেয়েদের আত্মজীবনীগুলিতে দেখি যৌথ পরিবারের জন্য রান্না এবং সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে সারা দিনে খাবার সময়টুকুও হত না,আলাদা করে অবসর যাপনের কথা কমই বলতে শুনি তাদের। মেয়েদের কাজের মধ্যেই মিশে থকত কিছু শখ,যা হয়ত তাদের নিরবিচ্ছিন পরিশ্রমকে সহনীয় করে তুলত। মেয়েদের অবসর যাপন ও চিত্ত বিনোদনের কথা তাই খুঁজে নিতে হয় এই সব সাংসারিক কাজকর্মের ফাঁকফোকর থেকে।

উনিশ শতকে অন্য সব কিছুর সাথে মেয়েদের অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রেও কিছু পরিবর্তন ঘটল। উনিশ শতক ছিল সংস্কার আন্দোলনের যুগ। এই সময় নারী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধিত হয়। এই পর্যায়ে নারী সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী আখ্যানের সাথে যুক্ত ছিল। জেমস মিলের মত পাশ্চাত্য চিন্তাবিদরা ভারতের সভ্যতার অগ্রগতী সংক্রান্ত সমালোচনায় নারী সমস্যাকে ব্যবহার করেন। ভারতীয় সমাজে নারীর দুরবস্থাকে সভ্যতার মাপকাঠিতে ভারতীয় সভ্যতার পশ্চাতপরতার নির্দেশক বলে মনে করা হয়। কাজেই উনিশ শতকের ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমাজ সংস্কার পরিকল্পনায় নারী সংক্রান্ত বিষয়টি প্রাধান্য পায়। এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নবনারী বা ভদ্রমহিলা নির্মান। এই প্রচেষ্টায় তাই অন্যান্য বিষয়ের পাসাপাশি মেয়েদের অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে রুচী পরিবর্তনের প্রসঙ্গটিও এসে যায়।

প্রবন্ধটিতে মেয়েদের অবসরযাপন ও চিত্তবিনোদন এবং উনিশ শতকের এই যুগ সন্ধিক্ষণে অবসরযাপনের ক্ষেত্রে ঘটা পরিবর্তনগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আলোচনাটি হিন্দু উচ্চবর্ণ এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শহুরে মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

আলোচনা

ভদ্রমহিলার অবসর যাপন ও চিত্ত বিনোদন

একান্নবর্তী পরিবারের সংসারের কাজের বর্ণনা দিয়েছেন রাসসুন্দরী দেবী, তাঁর আত্মজীবনী, 'আমার কথায়'। তাঁর বিয়ে হয়েছিলো বারো বছর বয়সে। কিছু দিনের মধ্যে শাশুড়ি অন্ধ হয়ে গেলে তাঁকেই সংসারের সব দায়িত্ব নিতে হয়। কাজের চাপ এত বেশি ছিল যে অনেক সময় সারা দিনে একবারও খাওয়ার সময় পেতেন না। তিনি লিখেছেনঃ

> "...ঐ সংসারটি বড় কম নহে....বাটিতে বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, তাঁহার সেবাতে অন্নব্যঞ্জন ভোগ হয়। বাটিতে অতিথি,পথিক সতত আসিয়া থাকে, তাহাদিগকে বাটির মধ্য হইতে সিধাপত্র দেওয়া হয়। এদিকে রান্নাও বড় কম নহে। আমার দেবর ভাশুর কেহ ছিল না বটে, কিন্তু চাকর চাকরানী প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশজন বাটীর মধ্যে খাইত, তাহাদিগকে দু বেলাই পাক করিয়া দিতে হত..... এক সন্ধ্যা দশ বারো সের চাউল পাক করিতে হইত [১]।"

এই বর্ণনায় সংসারের কাজের চাপে বিপর্যস্ত এক নারীর ছবি চোখে পড়ে।যৌথ পরিবারের জন্য রান্না এবং সন্তান প্রতিপালন করতে গিয়ে সারা দিনে যার খাবার সময়টুকুও হত না। অবসর যাপনের প্রশ্নটিই এখানে অবান্তর। কিন্তু, মেয়েদের কিছু শখ, যা তাদের কাজের মধ্যেই মিশে থাকে, হয়ত তাদের নিরবিচ্ছিন পরিশ্রমকে সহনীয় করে তুলত, এমন কি আনন্দময়ও করত। যেমন মেয়েদের মুখের গান। মেয়েরা কাজ করতে করতে গান গায়। বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে ঘুম পাড়ানি গান, মসলা কোটা বা আটা মাখার সময় গান, যার একটি নির্দিষ্ট তাল বা ছন্দ রয়েছে, জল আনতে গিয়ে গান, আর নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েদের ধান পোঁতা বা কাটার সময়ে আর ঢেঁকিতে ধান ভাঙ্গার সময় সমবেত গান।

মেয়েদের অনেক কাজই তারা যৌথভাবে করে, যেমন, শীতের দুপুরে ছাদে বসে বড়ি দেওয়া, আচার বানানো, কাঁথা সেলাই করা, একে অপরের চুলে তেল দেওয়া, চুল বাঁধা, পরিবারের সবার জন্যে পান সাজা, জাঁতিতে সুপারি কাঁটা, একান্নবর্তি পরিবারে যেহেতু রান্নার পরিমান অনেক বেশি তাই বাড়ির সব মেয়েরা একসাথে বসে কুটনো কুটত। যেমন দেখা যেত ঠাকুরবাড়িতে। অনেক সাবেকি যৌথ পরিবারে মেয়েরা সবাই এক সাথে মিলে রান্নাও করত। এই সব সময়ে,কথাবার্তা গান আর গল্প গুজবও চলত কাজের সাথে সাথে। এই সব মেয়েলী আড্ডাগুলির স্বাভাবিকভাবেই একটি সামাজিক অনুষঙ্গ থাকত।

এছাড়া পালা পার্বণ, ব্রত পালন ও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে,যখন অন্যান্য পরিবারের মেয়েরাও একত্রিত হত, তখন এই সব মেয়েলী সমাবেশগুলি নিশ্চয়ই উৎসব উদযাপন, অবসর যাপন এবং সাথে সাথে বিনোদনেরও সময় ছিল।

আরও একটু বৃহত্তর ক্ষেত্রে, যখন অন্নপ্রাসন, পৈতে বা বিয়ের মতো কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পরিবারের মেয়েরা যোগ দিত, তখন এই সব অনুষ্ঠানগুলির একটি আন্তসামাজিক আনুসঙ্গ থাকত।

সামান্য কম রক্ষণশীল ,পরিবারের মেয়েদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা, যেমন রাসের মেলা বা রথের মেলায় যাবার কথা শোনা যায়। বেশিরভাগ সময় তাদের সঙ্গে থাকত পরিবারের কোন পুরুষ, যে তাদের "আগলে" নিয়ে যেত। দুর্গা পূজার সময় যাত্রা দেখতে যেতে বা কীর্তন, তরজা, খেমটা, ঝুমুর বা কবি গানের বা কথকতার আসরে যাবার কথাও জানা যায়।

নাচ গানের আসর বাড়িতেও বসত। টপ্পা, তরজা ঝুমুর বা খেমটা নাচের আসর বসত বাড়ির উঠনে। শিল্পী মহিলা হলে অন্দরমহলেও প্রবেশ করতে পারত সহজেই। এই সব জনপ্রিয় সঙ্গীতের চর্চায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিল বৈষ্ণবীরা। বৈষ্ণবীদের জনপ্রয়তা শুধু মাত্র মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নারী পুরুষ নির্বিশেষে বিনোদনের জগতে তাদের বিশেষ সমাদর ছিল। কলকাতা থেকে বৈষ্ণবীদের দলের গ্রামে বা মফস্বলে গানের অনুষ্ঠান করতে যাবার কথা জানা যায়। পালা গানের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল প্রেম। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বা ভারতচন্দ্র রায়ের রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের বিদ্যা ও সুন্দরের প্রেম। যাত্রাপালা খুব জনপ্রিয় ছিল। দুর্গা পূজা বা কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাড়ির প্রাঙ্গণেও যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হত। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা চিকের আড়ালে বসে যাত্রা শুনত।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকে মেয়েদের সংস্কৃতিতে লোকশিল্পের জনপ্রিয়তার কথা আলোচনা করেছেন [২]। উনিশ শতকে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্যয় শুরু হলে গ্রামের মানুষ কলকাতায় এসে ভিড় করে রুজিরুটির সন্ধানে। এদের বেশিরভাগই ছিলেন নানা বৃত্তিধারী মানুষ। এদের আগমনের ফলেই কলকাতায় কুমারটুলি, কলুটোলা, শাঁখারিটোলা ইত্যাদি পাড়া গড়ে ওঠে। এরা নিজেদের সাথে গ্রাম থেকে নিয়ে আসে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি। লোকগীতি, যাত্রা, গান, গ্রাম্য ভাষা তাদের সাথেই গ্রাম থেকে শহরে আসে। এরা গ্রামীণ সংস্কৃতিকে শহর কলকাতায় শুধু বাঁচিয়ে রাখেনি, নাগরিক আবহ থেকে উপাদান নিয়ে আরও সম্বৃদ্ধ করে তুলেছিল। এই লোকশিল্পে – গান, গল্প, ছড়ায় মেয়েদের কণ্ঠস্বরও খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলির রচনায় মেয়েদের মুখ্য ভূমিকা থাকত এবং এর উপভোক্তা, অর্থাৎ দশর্ক/শ্রোতা হিসেবেও মেয়েরা থাকত প্রচুর সংখ্যায়। এর ভাষা ও বাকধারায় মেয়েলি ভাষার প্রয়োগ এবং বিষয়গুলিতে মেয়েলী ভাবনার প্রকাশ থাকায় এবং বিষয় বস্তুতে কখনো কখনো পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সুর থাকায় এগুলি শহুরে মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যেও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। এর মধ্যে দিয়ে শহুরে মধ্যবিত্ত এবং গ্রামীণ মেয়েদের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক যোগ সুত্র তৈরি হয়েছিল।

ভদ্রমহিলার রুচি পরিবর্তন

উনিশ শতকে একটি পরিবর্তন এল। শহুরে মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার লাভ করার ফলে এই সময়ে একটি প্রজন্ম তৈরি হইয়েছিল যাদের বিশ্বাস ও রুচি পাশ্চাত্য ভাবধারায় সম্পৃক্ত। ভিক্টোরীয় নীতিবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে এরা সমাজ ও সংস্কৃতি অশ্লীলতা মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়। বাংলায় এদের কাজকর্ম ও সংস্কৃতিতে তার অভিঘাত নিয়ে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একাধিক প্রবন্ধে বিশদে আলোচনা করেছেন। এদের তৎপরতার ফলে কলকাতার মত শহরগুলি থেকে লোকশিল্পী ও লোকসংস্কৃতি বিতাড়িত হয়।

এই প্রয়াসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুদের সমমনভাবাপন্ন, সম রুচির নারী নির্মান। এই নব্যনারী বা ভদ্রমহিলা নির্মান প্রচেষ্টায় তাই

অন্যান্য বিষয়ের পাসাপাশি মেয়েদের অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে রুচি পরিবর্তনের প্রসঙ্গটিও এসে যায়।

যাত্রা, নাটক ইত্যাদি দেখতে মেয়েদের নিষেধ করা হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। "যে বিষয়ে কেবল আমোদই লক্ষ্য, কি ধর্ম কি নীতি কি জনসমাজ কোন বিষয়েই শ্রীবৃদ্ধি নাই, তাহাতে যোগ দিলে তরলমতি স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা।"

শিক্ষিত সমাজের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ ছিল বৈষ্ণবীদের মতো মহিলা শিল্পীরা। এদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তপুরে অবাধ যাতায়াত ছিল। মেয়ে মহলে এদের জনপ্রিয়তাও ছিল ব্যপক। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শিক্ষিত ভদ্র সমাজের আক্রমনের লক্ষবস্তু হয়ে ওঠে এই সব নিম্নবর্গীয় মহিলা লোকশিল্পীরা। নতুন প্রর্বতিত নারী শিক্ষার পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল কলকাতার এই লোকসংস্কৃতি ও বিশেষভাবে মেয়েদের গান ও আচার অনুষ্ঠানের উচ্ছেদ। এইভাবে একে একে টপ্পা, ঢপ কীর্তন,পাঁচালি,ঝুমুর গান হারিয়ে গেল বাড়ির অন্তপুর থেকে এবং কলকাতার নাগরিক সাংস্কৃতি থেকে। আদমসুমারি থেকে জানা যাচ্ছে, ১৮৯১ বাংলায় ১৭,০২৩ জন বিভিন্ন ধারার মহিলা গায়িকা, নর্তকী,যাত্রা অভিনেত্রী ও তাদের সঙ্গত করার জন্য বাদক- বাদিকা ছিল, পরবর্তি দশ বছরে তাদের সংখ্যা কমে এসে ১৯০১ সালে মাত্র ৩,৫২৭ জনে দাঁড়ায় [৩]।

উত্তর প্রদেশ নিয়ে আলোচনায় চারুগুপ্তাও উনিশ শতকের শেষের দিকে ঘটা সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় জনপ্রিয় বিনোদন শিল্প মাধ্যমকে (popular entertainment) নিয়ন্ত্রণ করার একই ধরণের প্রয়াস লক্ষ করেছেন [৪]।

এই সব লোকশিল্প বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল নিম্নবর্গের মানুষ ও মেয়েদের মধ্যে। তাই এর অভিঘাত দেখা যায় মেয়েদের সাংস্কৃতিক জীবনে। তাদের প্রিয় লোকশিল্পীরা হারিয়ে যায় মেয়েদের বিনোদনের জগত থেকে [৫] ।

সাহিত্য পাঠঃ উনিশ শতকে ভদ্রমহিলার চিত্ত বিনোদনের নতুন উপকরণ

পরিবর্তে আসে বই এবং থিয়েটার। থিয়েটারের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ থকলেও এবং মাঝে মাঝে পরিবারের সবার সাথে থিয়েটার দেখতে যাবার কথা জানা গেলেও সহজ লভ্যতার কারণে বই ছিল অনেক বেশি জনপ্রিয়। উনিশ শতকের প্রথমে থেকেই মুদ্রণ শিল্পের প্রসারের ফলে বই সস্তা ও সহজলভ্য হয়ে যায়। শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে নারী শিক্ষা বিস্তার লাভ করার ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ নাগাদ লেখাপড়া জানা মেয়েদের একটি প্রজন্ম তৈরি হইয়েছিল। এদের মধ্যে সাহিত্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ জন্মায়। উনিশ শতক থেকেই মেয়েদের জন্যে নানা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। বামাবধিনী (১৮৬৩), অবলাবান্ধব (১৮৬৯), পরিচারিকা (১৮৭৮),ভারতী (১৮৭৭) ইত্যাদি অসংখ্য পত্রপত্রিকার কথা জানা যায়। এখানে কবিতা, নাটক,ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ, নীতিকথা, রন্ধন প্রণালী প্রকাশিত হত । এছাড়াও ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস প্রকাশিত হত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। সাহিত্যের এই নতুন ধারাটি,উপন্যাস বা নভেল মেয়েদের মধ্যে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

উপন্যাস হল আখ্যানমুলক কল্পকাহিনী, যা সাধারনত গদ্যে লেখা হয়। বাংলা উপন্যাসের জন্ম হয় উনবিংশ শতাব্দীতেই। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নববাবুবিলাস

(১৮২৫),হানা ক্যাথেরিন মুলেন্স রচিত ফুলমণি ও করুণার বিবরণ(১৮৫২) ইত্যাদি রচনাকে কেউ কেউ প্রথম বাংলা উপন্যাস মনে করলেও , অধিকাংশ গবেষক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দুর্গেশনন্দিনীকেই (১৮৬৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসাবে গন্য করেন। বাংলা উপন্যাসের বিকাশ ঔপনিবেশিকতা, ক্রমবর্ধমান মুদ্রণ সংস্কৃতি,নগরের বিকাশ এবং মধ্যবিত্ত পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল।

মেয়েদের মধ্যে উপন্যাসের জনপ্রিয়তার পিছনে একটি প্রধান কারণ ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রতিথযশা, বলিষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের লেখনী এই সময় বাংলার পাঠক সমাজকে বিমোহিত করে রাখত। কিন্তু মেয়েরা যে শুধু এঁদের মতো বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের নিবিষ্ট পাঠক ছিল তা কিন্তু নয়। মেয়েদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল,তারা বটতলার সস্তাদরের উপন্যাসেরও উৎসাহী পাঠক। ঠাকুর পরিবারের মতো বিদগ্ধ পরিবারের অন্দরমহলেও বটতলার উপন্যাসের প্রবেশ ঘটতে দেখা যেত। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, " মনে আছে মালিনী বাড়িতে বই বিক্রি করতে আসলে মেয়েমহল সেদিন কিরকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলায় যতকিছু নতুন বই, কাব্য উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প-ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক-অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরির কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত....." [৬] বটতলায় প্রকাশিত নাটক এবং পয়ার ছন্দে লেখা পদ্যও মেয়েদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু জনপ্রিয়তার নিরিখে উপন্যাস বা নভেলের স্থানই ছিল শীর্ষে।

মেয়েদের মধ্যে নভেল বা উপন্যাসের জনপ্রিয়তার অপর একটি কারণ ছিল সম্ভবত, উপন্যাস তাদের স্বপ্ন দেখাত। তারা বাস্তবের অবদমিত ইচ্ছাগুলি পুরন হতে দেখত উপন্যাসে। রক্ষণশীল সমাজে মেয়েদের বাস্তব জীবনে প্রেমের অবকাশ ছিল না। বেশিরভাগ মেয়ের বিবাহিত জীবন ছিল প্রেমের স্পর্শ রহিত। কারও জীবনে প্রেম এলেও তা অপূর্ণই থেকে যেত, সামাজের নিয়মের বেড়া ভেঙ্গে বিবাহে পূর্ণতা পেত না, তাই মেয়েদের প্রেম সার্থক হত, তাদের সব আশা আকাঙ্খা পূর্ণ হত একমাত্র উপন্যাসের পাতায়।

উপন্যাস যেমন মেয়েরা নিভৃত কক্ষে একা পড়ত, তেমনি আবার গল্প পাঠের আসরও বসত, যেখানে এক জন পাঠ করে শোনাত বাকিদের। এর কারণ হয়ত ছিল যে সবাই ভাল করে পড়তে জানত না। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে একক পাঠের হার বাড়তে থাকে। আর কথকতা পাঠের আসরে অভ্যস্থ থাকায় মেয়েদের এই ধরণের আসরে গল্প শোনার একটা রীতি আগে থেকেই ছিল। আর একটি কারণ হয়ত ছিল আলোর অপ্রতুলতা। কলকাতায় বৈদ্যুতিক আলো আসে ১৮৯৫ সাল নাগাদ। তারপর সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে বিদ্যুৎ আসতে নিশ্চয়ই আরও অনেক দিন লেগেছিল। সেই সময়কার অনেক গল্প-উপন্যাসে এই ধরণের গল্প পাঠের আসরের ছবি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালী উপন্যাসেও এই রকম গল্প পাঠের আসরের কথা আছে। মেয়েরা সংসারের কাজ সেরে উপন্যাস পাঠের আসর বসাত।

নভেলের প্রতি মেয়েদের এই অনুরাগ সমাজে এক উৎকণ্ঠার জন্ম দেয়। এই উৎকণ্ঠার দুটি মুখ্য কারণ ছিল। প্রথমত, নভেলের প্রতি আর্কষণ তাদের গৃহকর্ম বিমুখ করে তুলবে। মেয়েদের রান্নায় নৈপুন্য কমে যাওয়াকে স্ত্রীশিক্ষা ও উপন্যাস পাঠের ফল বলে শনাক্ত করা হয় [৭] । অভিযোগ ওঠে রান্না ও গৃহকজের পরিবর্তে আধুনিক শিক্ষিতারা গল্প উপন্যাস পড়ে

দিন কাটান। নভেল নায়িকা বা শিক্ষিতা বউ প্রহসনে দেখি, হরদেবের শিক্ষিতা বউ রুক্মিণী রান্না এবং সংসারের কাজ কিছুই করেন না, সারাদিন শুধু নভেল পড়েন [৮]।

দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল নরনারীর প্রেম। এই রোমাণ্টিক প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে মেয়েরা সনাতন ভারতীয় নারীর সতীত্বের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্যভিচারিণী হয়ে উঠব, এমনটাই আশঙ্কা করা হয়েছিল। তাই এই সময়ে উপন্যাস পাঠের কুপ্রভাব থেকে মেয়েদের বাঁচাতে ভুরি ভুরি প্রহসন, প্রবন্ধ, নীতিকথা লেখা হতে থাকে।

সিদ্ধান্ত

উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে নারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই সংস্কারের পরিধির মধ্যে এনে নারী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রন আরোপ করার চেষ্টা করা হয়। শুধু পড়াশনা বা কাজের উপরই নয়, তাদের অবসর সময় মেয়েরা কিভাবে কাটাবে, চিত্ত বিনোদন করবে কিভাবে সেই নিয়েও লেখা হতে থাকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। বিনোদনের ক্ষেত্রে রুচি যেন পরিশিলীত হয়, সেদিকে,ও সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়। বামাবোধিনী পত্রিকায় নির্দেশ দেওয়া হয় মেয়েরা যেন তাস খেলে, বা গল্প-পরিহাসে বা নাটক নভেল পড়ে সময়ের অপব্যায় না করে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রন কতটা কার্যকরি হয়েছিল বলা শক্ত, কারণ মেয়েলি আড্ডা, তাস খেলা, বা উপন্যাস পড়া বন্ধ হয়নি। বরং মেয়েরা নিজেরাই উপন্যাস লেখায় ব্রতী হয়। এইভাবে মেয়েরা তাদের নিজস্ব অবসরটুকুকে আগলে রাখার প্রয়াস অব্যাহত রাখে।

তথ্যসূত্র

[১] রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, দ্বিতীয় সংস্করণ,কলেজ স্ট্রিট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ২১, (১৯৫৯)।

[২] সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, প্রথম সংস্করণ, অনুষ্টুপ, কলকাতা, (২০০৮।

[৩] তদেব, পৃষ্ঠা ১৭৩-২০০।

[৪] C.Gupta, *Sexuality, Obscenity, Community : Women, Muslims, And The Hindu Public In Colonial India*, Permanent black, New Delhi, (2005).

[৫]সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাঙ্গণ-বিহারিণী রসবতীঃ উনিশ শতকের কলকাতার লোকসংস্কৃতিতে মহিলাশিল্পী, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-১৯৩।

[৬]স্বর্ণকুমারীদেবী, আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার, প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩৫৬।

[৭] U. Ray, The New Woman and Cuisine in Colonial Bengal, *Inclusive*, **Vol. II**, no. 20, pp. 106-118.

[৮] হার্দিকব্রত বিশ্বাস, সংকলন ও সম্পাদনা, নভেল নায়িকা বা শিক্ষিতা বউ, প্রহসনে কলিকালের বঙ্গমহিলাঃ১৮৬০-১৯০৯, প্রথম সংস্করণ, চর্চাপদ, কলকাতা, পৃষ্ঠা,২৯ (২০১১)।

Research Article

"*WORLDMAKING*": THE LEGACY OF NELSON GOODMAN

Madhuchhanda Bhattacharyya

Associate Professor, Dept. of Philosophy, Barasat Government College, West Bengal, India
Email: madhuchhanda.bhattacharyya@bgc.ac.in

Received: 24th March 2022 Revised: 18th May 2022 Accepted: 19th May 2022

Abstract: Nelson Goodman, a noted constructivist-antirealist believes, no philosophical progress is made, by arguments that advert to something we know not what. He rejects the idea that there is a world, which is separate and distinct from, any description of it. We can know the world only through some description or depiction of it. So nothing intelligible can be said about the world *independent of world-versions*. In effect, discarding the dichotomies between reality and appearance, between scheme and content, between noumena and phenomena, Goodman drops the idea of *an uninterpreted* world from all discourse. According to him, any attempt to drive a conceptual wedge between *objects as such* (reality) and *object as represented* (appearance) fails. Perception is *always* conceptual and 'facts' are *not neutrally given*. They are not found, rather *made* within the theories or symbol-systems. They depend on a particular frame of reference or have to be understood as a construction of a certain theory. So, different theorists, using different conceptual schemes, live in different worlds with different realities.

Obvious question will arise: do *all* world-versions make world? Moreover, what will happen if there are two competing world-versions for the same phenomenon? How to adjudicate between true and false world-versions? Or, we have to understand that Goodman is subscribing a sort of philosophy which adopts the principle of 'anything goes'? Again, what do we exactly mean by world-version? In which sense there are and can be *many* worlds? Should we understand this world-making literally? Above all, if all facts are fabricated, can Goodman's own view, being one of such countless world-versions, be free from the charge of 'self-refutation'?

By addressing these critical issues, present article will explore Goodman's novel thesis of worldmaking. The article, however, will also defend the immense influence of Goodman's antirealistic philosophy, especially to a brand of realists, who wants to deny metaphysical realism and tries to develop a sort of pluralistic realism.

Keywords: Nelson Goodman, relativism, pluralism, constructivism, worldmaking.

Introduction

If anyone is a hard-core, no-holds-barred relativist out-to-here, it is Nelson Goodman and he is not at all shy about declaring his advocacy of a thoroughgoing relativism. Goodman's position stems from the long-lasting dispute between realist and anti-realist philosophers.

Discussion

To sketch the dispute very briefly what can be said is that: realist philosophers traditionally have argued that our beliefs and statements are true or false depending on whether they present and are adequate to *the world* or *a reality independent of language and thought*. On the other hand, anti-realist philosophers do not find *any sense* in the realist's distinction between the world and the representations or descriptions of the world. They embrace the view that we cannot even begin to formulate the realist position in a coherent manner. For,

the only way we can begin to express any view about the mind-independent world is through our representations. Goodman writes:

> "We cannot test a version by comparing it with a world undescribed, undepicted, unperceived,...*While we may speak of determining what versions are right as 'learning about the world', 'the world' supposedly being that which all right versions describe*, all we learn about the world is *contained* in right versions of it; while the underlying world, bereft of these, need not be denied to those who love it, it is perhaps on the whole *a world well lost*."[1]

It seems Goodman allows that the *world-in-itself* need not be denied to those who *love* it. He is showing 'no love' to 'that world 'as 'that world' is literally an uneventful and uninteresting place for him. Perhaps Goodman contends that the world 'undescribed, undepicted and unperceived" is "well lost" in the sense that there is simply nothing that *one can say about it* or *do with it* other than assert its mere existence. Goodman sounds sympathetic to his friends who love this handful of uninteresting trivialities, but for him, the concept of 'world-in-itself' and its 'independent existence' should be dismissed as an *empty* idea.

So to have a world that is 'worth fighting for'[2], he seems to blur the distinction between 'world' and 'world-versions'. Since versions are *all* that we are capable of talking about (aside from trivial claims such as 'the world exists', etc.), why not *lose* talk of the world-in-itself and *embrace* talk of the world-versions as our *only* way of talking about 'the world' at all. Thus, talk of 'the world', according to him, seems to be reduced to talk of 'some world-versions'.

He refers to his own position as "radical relativism". He also says that his relativism is "equidistant from intransigent absolutism and unlimited license."[3] By the use of the term "unlimited license", he seems to avoid the kind of "irresponsible relativism", the thesis according to which "anything goes", a kind of relativism that takes all judgements as equally true. His relativism is contrary to irresponsible relativism so to say.

For an adequate characterization of Goodman's thesis of worldmaking, we have first to specify what is meant by "world-version". According to Goodman, it can not only refer to linguistic systems such as natural languages, but it may also refer to the 'language of art' e.g. notational system in music or artworks in case of painting. According to him, like scientific theories artworks too can serve cognitive purposes.[4] Goodman says that both scientific

theories and artworks share 'the property of being symbolic systems with rules of their own'. Goodman maintains that we use these systems in order to understand and construct our world of experience, in such a way that there can be words (or, more generally, symbols) without worlds, but no world without words or other symbols.[5]

But in which sense there are *many worlds*?—we can legitimately ask. In reply to that Goodman says that, two different frames of reference, or two incompatible but empirically equivalent scientific theories, or the different styles of painting by two masters belonging to different schools or periods, may be radically opposed in ways of interpreting the world, both being perfectly adequate. For example, one might construe the platypus as a mammal; another, as a bird; yet another, as an intermediate between a mammal and a bird. None of these discredits the others. Each comports with many of our relevant antecedent beliefs. Goodman says that relative to its own world version, each of these is right, relative to its rivals' each is wrong. But *absolutely* and *independently of the versions*, none is right or wrong. The acceptability of conflicting world versions, according to Goodman, is not a temporary condition that will be remedied by further inquiry. Some currently acceptable versions will no doubt be ruled out by future findings. But those findings will support a multiplicity of new versions. Divergent systems are acceptable, not because evidence is inadequate, but because even the most demanding criteria of adequacy turn out to be multiply satisfiable. Our standards of acceptability are not selective enough to yield a unique result. Nor do we know how to make them so. The plurality of acceptable versions results from the existence of mutually irreducible conceptual schemes. Accordingly, there will be several divergent versions of the same world. The problem is that we lack the resources to justify, or even make sense of the claim that all overlapping acceptable versions pertain to the same things. Without the scheme-content distinction, *we cannot distinguish conceptual from the factual.* Since conceptual schemes *provide* the criteria of identity for their objects and since mutually irreducible schemes do not invoke equivalent criteria, so, mutually irreducible schemes *define* distinct worlds. Thus, according to Goodman there are *many* worlds. The world as interpreted in a certain system is a '*creation*', or '*a construct'*, so that it can be said that there are 'many worlds', different versions, or ways of the world. All of them could be *valid for certain purposes*.

The point is that if we take such social construction of reality literally, then we have to conclude that, different groups of people using different conceptual schemes live in different worlds with different realities. As we cannot test a version by comparing it with a world as something *outside* and *independent* of all of our descriptions and ways of perceiving and understanding, so for Goodman, neither any particular right version nor the totality of the right versions can be said to represent "the world". Goodman is consequently opposed to the idea of reduction to a common base, to the physical or anything else. Usually, pluralism is in principle, compatible with reductionism in the sense that there can be many worlds, but such that they all can be reduced to one of them, being that which *really* represents the world. But in this sense, Goodman's pluralism is in fact incompatible both with realism and reductionism. According to him, perception is always conceptual and 'facts' are not *neutrally given*, but they depend on a particular frame or have to be understood as a construction of a certain theory. So facts are *fabricated. Goodman is then against the idea of an unstructured content or unconceptualized given.*

According to Goodman, not *all* world-versions constitute worlds, nor does every claim belong to some acceptable world-version, only the *right ones do*. Goodman's thesis has rigorous restraints. It is important to mention that instead of regarding versions as true or false, Goodman sees them as 'right' and 'wrong'.[6] According to him, truth seems to be dogmatic and monolithic, whereas rightness is multidimensional. Goodman maintains that there can be different and acceptable criteria of rightness or standards of acceptability for world-versions. The fact that such criteria exist, prevents his position from collapsing into a crude form of relativism according to which 'anything goes'. In making worlds, at least we cannot use any criterion we please. For example, to measure the duration of an event, we cannot take the account of pulse beats of our Prime Minister, because otherwise we would get a version in which the rate of change of all physical processes would depend on the Prime Minister's health. This version would in any case be avoided by Goodman for not satisfying a minimal principle of simplicity, which is a typical criterion of acceptability.

Of course right versions are right according to a certain set of acceptability criteria. Goodman distinguishes between different forms of making worlds through (right) versions: composition and decomposition, emphasis (or weighting), ordering, deletion and supplementation, deformation.[7] At the same time, he conceives different criteria for rightness. Consistence,

coherence, suitability for a purpose, accord with past practice and antecedent convictions are among the restraints that he recognizes. Fitting and working are the marks of an acceptable version. A world-version must consist of components that fit together. The version must fit reasonably well with prior commitments about the subject at hand. On contrary, such features as inconsistency, incoherence, arbitrariness and indifference to practice, ends and precedents are then, according to Goodman, are indicative of unacceptable world-versions. Standard of rightness do not vary with individual opinion. They are carefully selected from a long experience of training in knowledge.

Thus, Goodman's relativism does not give up the notion of truth *altogether*, but only the notion of truth as traditionally understood, that is, a kind of correspondence with reality. Statement, according to him, can be true or false *only* with reference to a certain version or frame of reference. Whether the earth stands still, or, it turns on its axis and revolves around the sun-- are questions to be treated within a certain system or version. According to Goodman, the mere question of whether the earth *really* moves or not is non-sensical, because these statements have to be considered true or false *only* within the context of a certain world-version. So in comparing the Ptolemaic and the Copernican system, as a true picture of the Universe, according to Goodman, what we *actually* do is that, we do not compare an astronomical system with a *cosmological reality*, with the '*real universe'*. The "universe as-it-really-is" is nothing accessible to us, the only things being accessible to us are collections of astronomical data (that cannot be neutrally given) as interpreted in one or another way.

That truth and rightness are *relative* to world-versions does not only mean that the world-making thesis implies that we make sentences true. By making versions that are right, Goodman makes a stronger claim that we *make* worlds. It seems to many, however, that by making worlds we are fixing 'truths'. For example, we can take the analogy of 'making and baking'. Once the cake is made, the truth of "it's chocolate" or "it contains 120 calories per ounce" is independent of the maker. What is nevertheless unpleasant for critics is the view that the rightness of versions is something that we ourselves determine. May be we are free of making world-versions, but the criterion of rightness should be determined by something external to us. According to Goodman, *there is indeed a determination*. All determinations

are *necessarily* version-bound. What counts as right is *relative* to a given context in terms that are dependent on our theories, goals and values. He writes:

> "...*rightness* of design and *truth of statements are alike relative to a system*: a design that is wrong in Raphael's world may be right in Seurat's, much as a description of the stewardess's motion that is wrong from the control tower may be right from the passenger's seat."[8]

Some critics have also pointed out that rightness cannot be an adequate surrogate for truth, because Goodman subscribes to multiple criteria and standards of rightness. But what will happen if these criteria conflict with each other? What will happen if our standards and goals reveal to be jointly unsatisfactory? Can we ever establish anything for being sure? Goodman seems to answer by saying that *we cannot attain such certainty*, but we have to start *somewhere*, with the best available, premises and principles, though these are provisionally acceptable. These are nevertheless, our best equipment and furniture in a world of uncertainties and handicaps.[9]

Many authors have objected that Goodman's radical relativism is not free from the charge of 'self-refutation'. Actually Goodman's relativism seems to receive two contrasted interpretations: a weak one, according to which there are version–neutral criteria by which alternative versions can be judged, and another, stronger one, according to which criteria of rightness are version-bound. Both these can be found in his *Ways of Worldmaking*. The problem comes when we add to the second, stronger interpretation the following idea, which also seems to be held by Goodman himself: that his philosophical meta-version (i.e. his own radical relativism with rigorous restraints) is itself *just one* of the countless possible meta-versions. He says: "My outline of the facts concerning the fabrication of facts is of course itself a fabrication."[10] So if we interpret Goodman as holding the second relativist position and we apply it to the thesis itself as if it were a version among others, we face the problem of relativism as a self-refuting thesis.

Lastly, I want to deal with the question: in *which sense* we make worlds in proposing right versions? Should we understand this worldmaking literally? Goodman seems to imply that we *make* stars and constellations. Is it the consequence of Goodman's relativism that *we make stars*? It is a fact that the question whether the Big Dipper exists or not does not make sense independently of very specific human ways of observing the sky and the stars. What is the case in Goodmanian terms, is that we *construct* an astronomical version in which a group

of stars is *seen* as exhibiting dipper shape—this is at least the way in which the astronomers saw it when they observed it for the first time. So by labelling the group in question "Big Dipper", they wanted to institutionalize the fact that that group of stars looks like a big dipper.

But there is a fundamental difference between the term "Big Dipper" and the term "star". Realists have criticized Goodman's particular position of *making* of the worlds. The "Big Dipper", according to them, is a typical proper name whose existence is fixed by linguistic convention. But the term "star" is rather different. It has an extension that cannot be fixed by convention and no particular object can be included in the extension of the term simply by virtue of being called a star. We do *not* make stars as the carpenter makes the table.

He is among those philosophers who think that there are different ways of classifying things and these ways are *not* independent of our language, conceptual schemes and theories. According to him, modes of organization is *not* found in the world, but *built into* a world. So, from his point of view, it may seem to be question-begging to appeal to the distinction between the artificial and the natural kinds. Once the distinction is abandoned, it may seem not implausible to think about properties as depending on our own ways of categorizing and theorizing. What we can consider to be an instance of a property, can *change* with the development of our scientific theories and the improvement of our inductive practices. A class[11] then *becomes* a kind relevant for science, 'sometimes miscalled 'natural', only through being distinguished from other classes, according to certain principles and proposals.

The realists may still argue that how is it possible for us to make something which is older than us. Goodman's answer seems to be like that: we make the past, by imposing a particular temporal ordering upon things and this temporal ordering is a consequence of certain theories, those are considered to be right versions of the history of the universe. Thus, according to him,

> "...worlds are not made from nothing,...but from other worlds. Worldmaking as we know it always starts from worlds already on hand; the making is a remaking."[12]

A realist philosopher, however, does not accept this view. A realist rather will be engaged in defending a realist theory of reference combined with metaphysics of natural kind objects.

Conclusion

It is by no means strange that his position against Goodman goes precisely in this direction. Goodman can actually count as a defender of a certain form of pluralism in scientific modelling. In reconfiguring philosophical problems, the solutions he offered, are not permanent resting places, but launch pad for further inquiry. In recent times, it has been revealed that pluralism can be compatible with realism. In fact, Goodman's philosophy has been characterized as a source of inspiration for Putnam's novel theory of internal realism and for his criticisms against metaphysical realism. But we all know that Goodman is an anti-realist philosopher per excellence. Anti realism does not mean idealism. Goodman is far from idealism as from metaphysical realism and always remained a sober rationalist.

Bibliography

[1] T. Bennigson "Is Relativism Really Self-refuting?" in *Philosophical Studies*, Vol. 94, No. 3, pp.211-236, (1999).
[2] D. Cox, "Goodman and Putnam on the Making of Worlds" in Erkenntnis, Vol. 58, No.1, pp. 33-46, (2006).
[3] M. Devitt, *Realism and Truth*, Basil: Blackwell, (1980).
[4] C. Z. Elgin (ed.) *The Philosophy of Nelson Goodman*, Garland Publishing Inc., New York, (1997).
[5] N. Goodman, *The Structure of Appearance*, Harvard Univ. Press, Cambridge, (1951).
[6] N. Goodman, *The Ways of Worldmaking*, The Harvester Press, (1978).
[7] N. Goodman, *Of Minds and Other Matters,* Cambridge, MA: Harvard University Press, (1984).
[8] J. F. Harris, *Against Relativism, A Philosophical Defence of Method*, La Salle: Open Court, (1992).
[9] C. G. Hempel, "Comments on Goodman's Ways of Worldmaking", in McCormick (ed.) *Starmaking*, *Realism, Anti-Realism and Irrealism*, MIT Press, Massachusetts, Cambridge, (1996).
[10] M. Lynch, *Truth as One and Many*, Oxford Univ. Press, Oxford, (2009).
[11] P. McCormick, (ed.) *Starmaking*, *Realism, Anti-Realism and Irrealism*, MIT Press, Massachusetts, Cambridge, (1996).
[12] H. Putnam, "The Way the World Is", in *Realism with A Human Face*, Harvard University Press, (1990).
[13] I. Scheffler, "The Wonderful Worlds of Goodman" in McCormick (ed.) *Starmaking*, *Realism, Anti-Realism and Irrealism*, MIT Press, Massachusetts, Cambridge, (1996).
[14] H. Siegel, "Goodmanian Relativism" in The Monist, Vol. 63, No. 3, pp. 359-375, (1984).

Internet Resources

[15] www.antirealism.com
[16] www.constructivism.com
[17] www.jstor.org
[18] Oxford.journals.org
[19] www.rep.routledge.com (Routledge Encyclopaedia of Philosophy Online)
[20] www.relativism.com

End Notes

[1] N. Goodman, *The Ways of World making*, The Harvester Press, p.4. Emphasis added, (1978).
[2] This coinage is propounded by M. Devitt. See Devitt, Michael *Realism and Truth*, Basil: Blackwell, p. 15, (1980).
[3] N. Goodman, *Of Minds and Other Matters,* Cambridge, MA: Harvard University Press, p.40, (1984).
[4] N. Goodman, *The Ways of Worldmaking*, The Harvester Press, p. 102, (1978).
[5] *Ibid*., p. 6.
[6] *Ibid*., p.122.
[7] *Ibid*., p.7.
[8] *Ibid*., p.139. Emphasis added.
[9] *Ibid*., p.40.
[10] *Ibid*., p.107.
[11] N. Goodman, *Of Minds and Other Matters,* Cambridge, MA: Harvard University Press, p.36, (1984).
[12] N. Goodman, *The Ways of World making*, The Harvester Press, p. 6, (1978).

Research Article

সমন্বয়ের সাধনায় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, বারাসাত গভঃ কলেজ

ই-মেইল: antara.banerjee@bgc.ac.in

Received: 19th April 2022 Revised: 16th June 2022 Accepted:17th June 2022

সারসংক্ষেপঃ উনিশ শতকের বাংলায় যেসব মনীষী নবজাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রী গিরীশচন্দ্র সেন। নানা দোলাচলে ভরা তাঁর জীবন তাঁর সময়কালের মতোই বৈচিত্রময়। রাঢ় বাংলার শাক্ত পরিবারে অবক্ষয়িত মূল্যবোধের মধ্যে বড় হয়েও পরবরতীকালে কেশবচন্দ্র সেনের সান্নিধ্যে এসে তিনি সমাজসংস্কারে ব্রতী হয়েছেন। সহস্র প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজীবন ব্রাহ্মসমাজের অনুগামী থেকেছেন। নজিরবিহীনভাবে ইসলামি সাহিত্যের অনুবাদে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে নিজেকে নিবেদিত করেছেন। এই লেখা ভাই গিরীশের প্রতি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সূচক শব্দঃ কেশবচন্দ্র সেন, ব্রাহ্মসমাজ, কোরান, হাদিস, স্ত্রীশিক্ষাপ্রসার।

ভূমিকা

আজ কথা বলব ভাই গিরীশচন্দ্র সেনকে নিয়ে, যিনি একই সঙ্গে সংকলন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও মুসলমান সাধুসন্তদের জীবনচরিত, উনিশ শতকের ব্রিটিশ বাংলায় মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন নিয়ে সংবাদপত্রে বারংবার লিখেছেন অমূল্য সব লেখা, গোঁড়া শাক্ত পরিবারে অবক্ষয়িত মূল্যবোধের মধ্যে বড় হয়ে রাঢ় বাংলার বিচিত্র সমাজজীবনের সাক্ষী থেকেছেন, আবার কেশবচন্দ্রের অনুগামী হয়ে নববিধান ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করেছেন, সমাজসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

আলোচনা

জন্ম তাঁর ১৮৩৪ অথবা ১৮৩৫ সালে, ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীনে পাঁচদোনা গ্রামে এক বৈদ্য পরিবারে। জাতিতে বৈদ্য হলেও তারা ধর্মাচরণে ছিলেন শাক্ত। তাঁর খুল্ল প্রপিতামহ দর্পনারায়ণ মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খাঁর সরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। বহু জনহিতকর কাজ করেছেন, দয়ালু ও দানশীল বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। পিতা, পিতামহ সকলেই ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আবার তাঁর দাদা হরচন্দ্র সংস্কৃত কাব্যের চর্চা করতেন। আয়ুর্বেদচর্চাও করতেন। কুলগুরু বিশ্বনাথ পঞ্চাননের কাছে গিরিশের বাংলায় হাতেখড়ি, বাবার কাছে ফারসী ভাষায়। মা বাবা গত হলে অগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র তাকে ভর্তি করে দেন ঢাকা পোগোজ স্কুলে। মাত্র পনের দিন পর স্কুল ছেড়ে তিনি আবার ফারসী ভাষা পড়া শুরু করেন। ১৮-১৯ বছর অবধি ফারসী পড়ে আবার শুরু করেন সংস্কৃত পড়া।

ISSN 0976-9625/**9(2)**, 2022

ময়মনসিংহ জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এর কোর্টে কিছুকাল তিনি কপিরাইটার ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন কিছুদিন। পরে হার্ডিঞ্জ স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এসময় তাঁর বিবাহ হয়। স্বল্পকালের দাম্পত্য হলেও তাঁর জীবনে স্ত্রী ব্রহ্মময়ীর গভীর প্রভাব পড়েছিল।

পাঁচদোনা গ্রামে নিতান্ত দরিদ্র মানুষের বাস ছিল। স্ত্রীপুরুষে নীতির বন্ধন ছিল শিথিল। গিরিশের আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ঘোর মদ্যপ। ছোঁয়াছুঁয়ি, জাতপাতের ভেদ তাঁর মধ্যেও তীব্র ছিল, একথা তিনি নিজমুখে বলেছেন। শুরুর দিকে তিনি ব্রাহ্ম চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ জেনে তিনি তাঁর 'বোধোদয়' স্পর্শ অবধি করতে চাননি। পরে ধীরে ধীরে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তার যোগাযোগ বাড়ে। আস্থা বাড়ে। ১৮৬৫ সালে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কেশবের বাগ্মিতা ও সমাজসংস্কারে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আন্তরিক প্রয়াস তাকে প্রভাবিত করে। তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কলকাতায় এসে তিনি সক্রিয়ভাবে সমাজের কাজে যোগদান করেন।

যদিও এর ফলে পরিজনেরা তাঁকে একঘরে করেন। স্ত্রী তাঁর ধর্মে সহগামিনী হতে চেয়ে গৃহে অকথ্য অত্যাচারের মুখে পড়েন। অতঃপর গিরিশ তাকে কলকাতায় নিয়ে আসেন নিজের কর্মস্থলে। লেখাপড়া শেখাতে শুরু করেন। কিন্তু অকালে সন্তানের মৃত্যু ও বসন্তরোগে ব্রহ্মময়ীর মৃত্যুতে গিরিশের হৃদয়ে বৈরাগ্য এল। তিনি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, কঠোর বৈধব্য পালন করে গেছেন। সাদা থান ধুতি পরতেন, নিরামিষ আহার করতেন।

স্কুলে থাকতে তিনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য বই লিখেছিলেন 'বনিতাবিনোদন' নামে। লিখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি ও জীবনী। শেকসপীয়রের নাটকগুলি অনুবাদ করেছিলেন বাংলায়। এইটিই শেকসপীয়রের রচনার প্রথম অনুবাদ। এছাড়াও ঢাকাপ্রকাশ, সুলভ সমাচার, বঙ্গবন্ধু প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। প্রকাশ করেছিলেন মাসিক মহিলা পত্রিকা।

১৮৬৯ সালে কেশব তাকে ইসলামি সাহিত্য পড়াবার দায়িত্ব দেন। পরে, ১৮৭৬ সালে তিনি লখনৌ যান আরবি, ইসলামি সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্য। পণ্ডিত মৌলবি এহসান আলির কাছে ব্যাকরণ ও হাফেজ চর্চা করেন, কোরান পাঠ করেন। পাঁচ বছর পড়াশোনার পর তিনি বাংলায় প্রথম সটীক কোরান অনুবাদ করেন ফারসী থেকে। অনুবাদ করেছেন মিশকত শরিফ (প্রায় অর্ধেক) হাদিথ-পূর্ব বিভাগ নামে।

১৯ শতকে রাজা রামমোহন রায় ইসলামি শাস্ত্র ও ধর্মের আলোচনা করেছেন তাঁর লেখায়। গিরিশ তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী। কেশবচন্দ্রের নির্দেশে তিনি একাজে ব্রতী হন। মহাপুরুষচরিত (১ম ভাগ) এব্রাহিম, মুসা ও দাউদের জীবনচরিত। মহাপুরুষচরিত (২য় ভাগ) মহাপুরুষ মোহাম্মদের জীবনকাহিনি। এছাড়াও লিখেছেন, 'এমাম হাসান ও হোসায়নের জীবনী', 'চারিজন ধর্মনেতা' (চার খলিফা - আবু বকর, ওমর ফারুক, ওসমান ও আলির জীবন ও ধর্মপ্রচার), 'চারিটী সাধ্বী

মুসলমান নারী' (দেবী খাদিজা, ফতেমা, আয়েশা ও সাধ্বী রাবেয়ার কথা), 'তাপসমালা' (ছটি খণ্ডে শেখ ফরিউদ্দিন আত্তারের 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' নামক ফারসী বই অনুসরণে ৯৬ জন মুসলিম সন্তের জীবনী)।

অনুবাদ করেছেন 'মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এসলাম ধর্ম'। ভূমিকায় লিখেছেন, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ সব দেশের সব সম্প্রদায়ের সাধুসন্তদের কাছে সত্য শিক্ষা করতে উপদেশ দেয়। '... আমরা (ব্রাহ্মগণ) মোসলমান জাতির স্বর্গনরক ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের মতগত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের সঙ্গে ধর্মসম্বন্ধে অধিকাংশ বিষয়ে যেরূপ ঐক্য হইতে পারি, অন্য কোন জাতির সঙ্গে সেরূপ নয়। কেননা মোসলমান অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক, কোনরূপ পৌত্তলিকতা বা অবতারবাদ ইত্যাদি সংস্রব রাখে না'।

এছাড়াও বহু ফারসী শাস্ত্র তিনি অনুবাদ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' কাব্যের গদ্যানুবাদ 'হিতোপাখ্যানমালা ১ম ভাগ' অসম ও বাংলার অনেক স্কুলে পাঠ্য ছিল। এতে আখ্যানের মধ্যে দিয়ে পরোপকার, বিনয়, কৃতজ্ঞতা, প্রেম প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি উন্মেষের জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। 'হিতোপাখ্যানমালা ২য় ভাগ' পরিব্রাজক কবি সাদীর ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতার ফসল 'বুস্তান' নামে নীতিমূলক গ্রন্থের অনুবাদ। এছাড়াও নানা সময় তিনি অনুবাদ করেছেন 'কিমিয়া সাদাত' নামে মূল বই থেকে অনূদিত 'নীতিমালা', ইসলাম সাধকদের সাধনপ্রণালী 'দরবেশী', পারসী সাধু মকদুম শরফোদ্দিন আহমেদ মনিরীর দশটি চিঠির অনুবাদ 'মহালিপি'। 'তত্ত্বকুসুম', 'তত্ত্বরত্নমালা', 'প্রবচনাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে দরবেশদের উপদেশবাণী ও সাধনা তুলে ধরেছেন বাংলায়। অনুবাদ করেছেন রাজা রামমোহন রায়ের লেখা 'তুহফতুল মোহাদিন' গ্রন্থেরও। সব ধর্মের মূলগত ঐক্যে বিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র দেখিয়েছেন, নিজের ধর্মের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকলে অন্য ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকা যায়। তাঁর অবদান স্মরণ করে বাংলার মুসলমান সমাজ তাঁকে 'ভাই গিরিশ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন দুজনেই কবি হাফেজের লেখা কবিতা পড়ে ভাবে বিভোর হতেন। কেশবের আগ্রহে তিনি ইরানের এই ঈশ্বরপ্রেমিক কবির 'দেওয়ান হাফেজ' থেকে চারখণ্ডে অনুবাদ করেছেন।

কন্যার বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজের আন্তর্বিরোধের ফলে কেশবচন্দ্র যখন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, সেসময় শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গিরিশচন্দ্র তাঁর পাশেই ছিলেন। কেশবের প্রতি অটল বিশ্বাস ও নববিধানের সমন্বয়ের আদর্শে আজীবন আস্থাশীল ছিলেন তিনি।

কেশবের সূত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। ঠাকুরের প্রথম জীবনী রচনা করেন গিরিশ। সংকলন করেন তাঁর বাণী। এছাড়াও তিনি যখন যেখানে ধর্মপ্রচারে গেছেন, সেখানকার ইতিহাস ও পৌরাণিক বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন ধর্মতত্ত্ব পত্রিকায়। তাঁর এই লেখাগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য লিখেছেন নববিধান প্রেরিতগণের বিধি, তত্ত্বসন্দর্ভমালা (নববিধান এর তাত্ত্বিক রূপ)। মহিলা পত্রিকায় একদিকে নারীশিক্ষা, বাল্যবিবাহরোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহবিরোধিতা এসব সামাজিক সমস্যার কথা তুলেছেন, আবার রাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প নানা বিষয় আলোচনা করেছেন। চিঠিপত্র থেকে জানা যায় এর পাঠিকারা গিরিশের পরম ভক্ত ছিলেন। অসমবয়সী মুসলমান মেয়েরাও তাঁর লেখা পড়ে তাঁকে সন্তানস্নেহে ভরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'আত্মজীবন' উনিশ শতকের সমাজ ও ইতিহাসের এক অনন্য দলিল।

সিদ্ধান্ত

তিনি রেখে গেছেন বহু বক্তৃতা ও অগ্রন্থিত প্রবন্ধ। রেখে গেছেন অজস্র সংগৃহীত গ্রন্থ। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সে সমস্তই নষ্ট হয়ে গেছে। জীবনীকার সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছেন, 'যে পথে তিনি হেঁটেছেন সে পথে তিনি একাই ছিলেন'। তাঁর মৃত্যুর(১৯১০) পরেও কেউ মুসলমান ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সমন্বয়ের কথা বলেননি, চেষ্টাও করেননি। এমনকি হাদিসের যে অংশ তিনি অসমাপ্ত রেখে গেছেন, আজও তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, তাঁর শতাধিক বছর পরেও ঠিক যেভাবে সমাজমানস রয়ে গেছে অপ্রাপ্তমনস্ক, সাম্প্রদায়িক ভাবনায় অসহিষ্ণু।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

[১] সাঁফুই, গৌরী, *গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০) - জীবন ও সাহিত্য*, অনলাইনে প্রাপ্ত গবেষণাপত্র, ডিসেম্বর, (২০২২)।
[২] সেন, গিরিশচন্দ্র, *আত্মজীবনী*, কলকাতা, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, (২০১৭)।
[৩] সেন, ভাই গিরিশচন্দ্র, *কোর্ - আন্ - শরীফ*, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, নববিধান পাবলিকেশন কমিটি,(১৯৩৬)।

Research Article

The Influence of Nyāya-Vaiśeṣika Philosophy on the Interpretation of Śaṅkuka

Poulomi Saha

Assistant Professor, Departmental of Sanskrit, Barasat Government College, West Bengal, India
Email: samgen.cbcs@gmail.com

Received: 4th March 2022 Revised: 5th May 2022 Accepted: 6th May 2022

Abstract: Śaṅkuka is famous for his doctrine named Anumitivāda. The interpretation of Śaṅkuka is based on the inferential process and theories of Nyāya philosophy in a restricted sense and Nyāya-Vaiśeṣika philosophy in the broader sense. So it is necessary to get a preview of the concept of inference as depicted in the Nyāya-Vaiśeṣika school.

Śaṅkuka argues that a spectator can infer the imitated *sthāyibhāva* only in the actor or actress and then experiences aesthetic delight which is *rasa.* According to him the permanent mood is apprehended by inference on the strength of inferential signs. With his acting skills the *naṭa* skilfully expressed the *anubhāva* and *vyabhicāribhāva*. So the spectators took them to be as real. Now, the internal connection of *vibhāvas* come as the *hetu*, and with the help of the *hetu*, the spectators can infer the *sādhya*
i.e. permanent mood which is imitated and settled in the *pakṣa* i.e. *naṭa*. As the permanent moods are related to the original dramatic persona so by the conjunction of *vibhāvānubhāva-vyabhicāribhāva* as the emulated *hetu (vibhāvaditrayasaṃyoga)*, the emulated permanent mood is inferred.

As Śaṅkuka is the well-known scholar of Nyāya school so there was a mere chance that he would be highly influenced by the of Nyāya philosophy. The epistemology and logical reasoning of Nyāya's syllogism left a strong impression on his interpretation of *rasa* theory. The main purpose of his interpretation is apparently on the process of tasting *rasa* but here he discussed some ideas of philosophy in connection with the process. While dealing with the concept of cognition, Śaṅkuka analysed it from logical and metaphysical standpoints. The analysis of cognition from these different points of views gives rise to this conclusion.

Key words: Nyāya philosophy, *Anumiti, sādhya, pakṣa, hetu, vibhāvānubhāva-vyabhicāribhāva, . naṭa, sthāyibhāva.ra*

Introduction

Four great analysts of Bharata's *Rasasūtra* have marked a distinctive sphere of academic interest by their esteemed elucidation. Bhaṭṭa Lollaṭa's explanation of *Rasasūtra* is called *Utpattivāda* . Bhaṭṭa Śaṅkuka's explanation is known as *Anumitivāda* . Bhaṭṭa Nāyaka explains the *sūtra* in a new way which is known as *Bhuktivāda.* Abhinavagupta, the greatest exponent of Sanskrit literary criticism, explains the sutra in a novel way and thus refutes all the views of his predecessors. His explanation is known as *Abhivyaktivāda.*

Discussion

According to the scholars of Indian aesthetics Śaṅkuka lived and worked approximately during the period of the second half 800 A.D. onwards. P.V. Kane adheres, Abhinavagupta often mentions Śaṅkuka 's views on different theatrical themes. Since the quotation relates to the theories involved in *NŚ*, Chapters three to twenty nine, it is likely believed that Śaṅkuka commented on the whole *NŚ* and he is also the author of a text named *Bhuvanābhyudaya. –'this would assign him to about 840 A.D.'* [1]

We would like to discuss Śaṅkuka's interpretation of *Rasasūtra* which is named *Anumitivāda.* Ācārya Śaṅkuka interpreted the famous *Rasasūtra in* a different way. The main purpose of his interpretation is apparently on the process of tasting *rasa* but here he discussed some ideas of philosophy in connection with the process.

According to Śaṅkuka, in the drama, all the aesthetic elements such as, *vibhāvas* (the causes known as the factors)*, anubhāvas* (the effects consisting of the reactions) and *sancāribhāvas* (the auxiliary causes namely transitory emotions) are totally dependent on the characters of the drama. Again the *sthāyibhāvas* (permanent moods) also lie within them. So a dramatic persona is the possessor of *rasa* to come into being. But in reality these dramatic characters cannot come and perform on the stage themselves, so the spectators cannot perceive directly the exact emotional feelings lying in them. It is never ever possible that the spectator can relish the same feeling of the hero or heroine.

Thus it requires a suitable medium, who should be a normal person with some extraordinary quality. The quality is that he should have excellent acting skills. This person is known as the *naṭa.* With all his skill he emulates the dramatic character. The light, dress, make -up, sounds etc. help him to portray his or her role in a living and attractive manner. He or she gives up his or her personal identity at the time of acting. The acting flourishes with the efficiency of *naṭa* or *naṭī.* Due to his perfect acting, the spectator feels that the *naṭa* or *naṭī* is not different from the dramatic character.

The main cause of *rasaniṣpatti* is the triangular connection of *vibhāva* , *anubhāva* and *vyabhicāribhāva*. *Vibhāva*s (the foundational and stimulant factors) can be understood by the narrative words used in the drama or *kāvya*. The *ālambāna-vibhāva* (foundational factors) and the *uddīpana-vibhāva* (stimulant factors such as environment) are narrated in the literary work. The *naṭa* or *naṭī* are actors or actresses who by their prominent actions are portrayed as the male hero or female heroine or other characters. . After hearing their dialogues presented in a literary work or watching their appropriate dresses and their gestures, appearances by *abhidhā* (denotation power) spectators can know the *naṭī* as the *vibhāva* of the *naṭa* or the *naṭa* as the *vibhāva* of *naṭī* in case of *sṛngāra-rasa* . This is comprehended through the literary.

After the *vibhāvas* are defined, *anubhāva* comes next. *Anubhāvas* are the reactions the actor is trained to produce; these are the effects of the *vibhāvas* emulated and expressed by *naṭa*. *Anubhāva n*eeds skill of acting, regular practise of facial expression; education etc. The *anubhāva*s are manifested by the actor which he is able to accomplish due to training and practice. *Sancāribhāvas* are the transitory emotions that are gotten by inference from their own associated reactions to the situation

alike. Thus the *vibhāvas*, *anubhāva*s and *Sancāribhāvas* are prompt to the viewer.

His key argument is *sthāyibhāva* is also the imitation or emulation or *anukaraṇa* or *anukṛti*. No one can directly perceive the emotions, because they are in abstract forms. So the spectators ought to infer it.Therefore, the word *'niṣpatti'* in *Rasasūtra* should be interpreted as '*anumiti'*. The resultant cognition of such inference cannot be the real entity itself. The relationship among the aesthetic elements or the conjunction *(saṃyoga)* of *vibhāva*, *anubhāva* and *sancāribhāvas* are referred to there is the inferential signs, '*vibhāvādyayoge sthāyino liṅgābhāvenāvagatyanupapatterbhāvānāṃ pūrvamabhidheyatāprasaṅgāt...'*.[2]

This explanation is based on a particular logical dimension and that dimension is new or *abhinava*. Thus it is necessary to explain the procedure from a different point of view. *Naṭa* cannot express the permanent mood directly. Śaṅkuka said that all the *bhāva*s and the permanent mood is hero's own property, but the spectators only watch those which are expressed by *naṭa.*

Though perception is the most powerful and prominent *pramāṇa* to know objects in this case it is not applicable .The permanent mood (*sthāyibhāvas)* cannot be apprehended by verbal expressions, acting or literary narrative. Though they are named as *rati (*desire*), śoka* (grief)*, has* (comedy) etc for referential language but the meaning which comes from the words cannot express the exact sentiments. Words only can determine objects. Moreover words are connected with their own meaning. As the *ghaṭa* determines to *kambugrībadimān padārtha* or object. Thus *rati* etc are words that only portray the meaning as desire but the exact expressive internal emotion of taste or relishes cannot be understood through the words. For instance by the word sweet people can understand the meaning as this thing contains sweetness but through the word they cannot be able to taste the sweetness essentially connected with the sweet object.

'sthāyī tu kāvyabalādapi nānusandheyaḥ | 'ratiḥśoka' ityādayo hi śabdā ratyādikamabhidheyīkurvantyabhidhānatvena | na tu vācikābhinayarūpaṭayā 'vagamayanti' //[3]

Śaṅkuka argues that a spectator can infer the imitated *sthāyibhāva* only in the actor or actress and then experiences aesthetic delight which is *rasa.* According to him the permanent mood is apprehended by inference on the strength of inferential signs. With his acting skills the *naṭa* skilfully expressed the *anubhāva* and *vyabhicāribhāva*. So the spectators took them to be as real. Now, the internal connection of *vibhāvas* come as the *hetu*, and with the help of the *hetu*, the spectators can infer the *sādhya* i.e. permanent mood which is imitated and settled in the *pakṣa* i.e. *naṭa*. As the permanent moods are related to the original dramatic persona so by the conjunction of *bhāvānubhāva-vyabhicāribhāva* as the emulated *hetu (vibhāvaditrayasaṃyoga)* the emulated permanent mood is inferred-

'tasmāddhetubhirvibhāvākhyaiḥ kāryaiścānubhāvātmabhiḥ sahacārirūpaiśca vyabhicāribhiḥ prayatnārjitatayā kṛtrimairapi tathānabhimanyamānairanukartṛsthatvena liṅgabalataḥ pratīyamānaḥ sthāyī bhāvo mukhyarāmādigatasthāyyanukaraṇarūpaḥ | anukaraṇarūpatvādeva ca nāmāntareṇa vyapariṣṭo rasaḥ' .[4]

After this apprehension the *sthāyibhāva* becomes the matter of relish. When the *sthāyibhāva* is relished by the audience it becomes *rasa.* So every aesthetic element can therefore be configured as elements of an inferential process whereby this emotion in the dramatic persona comes to be known. This explanation finds affinity with the procedure of *anumiti.* The term grief or *karuṇa* refers in everyday life to the sense of compassion. It receives the technical designation of the tragic *rasa* when the spectators apprehend the presence of imitated grief in the actor by the means or inferential signs. The *naṭa* therefore can be called *pakṣa* .The spectators infer the imitated permanent mood or *anukṛta-sthāyi* within him and it is designated by the special term *rasa*. Though the permanent moods may be considered as imitated since they are acquired by human effort, they are not recognized as invalid or factitious.

As the interpretation of Śaṅkuka is based on the inferential process and theory of *Nyāya* philosophy in a restricted sense and Nyāya-Vaiśeṣika in the broader sense, so it is necessary to get a preview of the concept of inference as depicted in the Nyāya-Vaiśeṣika School .

This section introduces the implication of the theory of inference of Nyāya-Vaiśeṣika philosophy on Śaṅkuka 's interpretation of *Rasasūtra* . In Sanskrit terminology inference is generally known as *anumāna*. Etymologically *anumāna* is a combination of two words: *anu* and *māna*. *Anu* means after and *māna* means 'knowledge'. So the meaning derived from these two words is 'after one certain knowledge' and in a broader sense it can be explained as 'after perception'. *Anumiti* or inferential cognition is a knowledge which arises after another perceptual knowledge.

According to Annaṃbhaṭṭa Definition of *Anumāna*

After the deep discussion on perception, Annaṃbhaṭṭa comes to the second type of instrument of *pramā*. He gave the definition of *anumāna* as the instrument by which the inferential cognition or *anumiti* can be acquired-'*anumitikaraṇamanumānam.*'[5]

Annaṃbhaṭṭa holds that *karaṇa* is the extraordinary or special cause among all the causes, through which the particular effect is, produced *'asādhāraṇam kāraṇam karaṇam'*[6].
Karaṇa can be distinct from causes by using the term *asādharaṇa* . It may be used in the sense of terminal and absolute cause. According to Annaṃbhaṭṭa inferential cognition or *anumiti* results from *parāmarśa* which is again a special kind of cognition. Annaṃbhaṭṭa declared *parāmarśa* as the *karaṇa* of inferential knowledge. *Karaṇa* is the uncommon or *asādhāraṇa* cause. Here the uncommonness implies the cause with reference to an effect. It is the cause which leads to the effect directly. Gopinath Bhattacharya enumerated,

"It is to be noted also that, from the standpoint of the current usage ,Annaṃbhaṭṭa is not quite steady in his usage of the term 'karaṇa'. In the case of 'pratyakṣa-pramā', 'upamiti' and 'śābda-bodha', he takes the term to mean the casual condition that functions through an 'intermediary' or a 'vyāpāra', but in the case of 'anumiti-pramā' the term is taken in the sense of a causal condition that appears last on the scene."[7]

Terms of inference

So from the linguistic analysis of citations it is obvious that inference must have some constituents. It has three important terms and a basic syllogism in general. *Pakṣa, sādhya* and *hetu* - these three terms are the important and basic pillars which are involved in this inference. These terms can be translated in English as, locus (*pakṣa*), probans (*hetu*) and probandum (*sādhya*). The terms will be discussed here to attain the theory of Śaṅkuka's *Anumitivāda*.

The *sādhya* or probandum is that something the observer wants to prove or establish or acknowledge in the inference. The *sādhya* or probandum is here- '*mūlacaritānukaraṇarūpa-sthāyibhāva ,* as it is the final outcome which is it is proved or established or acknowledged from the inference. It is the *sādhya* which is to be inferred in relation to the *pakṣa* or *naṭa.*

The *hetu* or probans is the mark or sign which indicates the presence of the object which is to be inferred. The conjugation of the three components *vibhāva, anubhāva, sancāribhāva* or *vyabhicāribhāva* is the mark or sign which indicates the presence of the inferable object . In this body of inference, '*mūlacaritānukaraṇarūpavibhāvāditrayasaṃyoga' '* is the mark or sign which indicates the presence of the object which is to be inferred. Thus it is the probans (*hetu*).

In simple language *pakṣa* is the locus or an entity where the inferable object is doubted or predicated. In other words *pakṣa* is meant to be that entity where an uncertain entity named *sādhya* to be predicated, on the strength of another entity named *hetu.* Annaṃbhaṭṭa thus defines *pakṣa* as '*sandigdha-sādhyavān pakṣa*.' Here *naṭa* is the *pakṣa*. In other words *naṭa* is the subject or an entity where the probandum (*sādhya*) *mūlacaritānukaraṇarūpa-sthāyibhāva* is predicated . According to the above mentioned discussion, in simple words the actor or *naṭa* is meant to be that entity where *mūlacaritānukaraṇarūpa-sthāyibhāva* to be inferred, on account of the correlation of tripod,

mūlacaritānukaraṇarūpa-vibhāvāditraya - saṃyoga .

In Nyāya theory of inference, the observer finds several steps to reach the conclusive inference. The uncertain probandum which is sought to be established is to be written first, this is the conclusion of the inference; then the reason for the conclusion is to be written and then the affirmation of the recollection between the *hetu* and the *sādhya* is to be written.

To understand this let us take the simplest body or example of inference: The hill is fiery, because the hill is smoky. Finding smoke rising from a hill, the observer remembers that since smoke cannot be without fire, he comes to the conclusion that there must also be fire on the hill. It is a procedure named *anumāna*. GB enumerated, *"That which is characterized by an uncertain probandum is the pakṣa or the subject [of an inference];for example, if the 'property of having smoke'(dhūma-vattva) be the probans , the 'hill'[is the pakṣa]"* [8]

If the steps are keenly followed then there the observer could see first, the knowledge of smoke is depicted as a mark or *liṅga* or *hetu* which indicates the presence of the object which is to be inferred. Fire is the *sādhya* which is to be inferred in relation to the *pakṣa*. The hill is *pakṣa*. Secondly, there is the recollection of the relation of *vyāpti* (invariable concomitance) between smoke and fire as the observer has observed that in the past. After the consideration of the *hetu* as prevaded by the *sādhya,* through their relation of invariable concomitance, the knowledge of inference occurs. Thirdly, there is the knowledge of the existence of the unperceived fire in the hill which is intended to be inferred (*sādhya*). This process of inference is called *linga-parāmarśa* . So *anumāna* is also

defined as *liṅga-parāmarśa*. There is the perception of a mark or reason which may be called as probans or *hetu*, (e.g. smoke) in a subject or *pakṣa* (hill). Secondly there is a recollection of the relation of invariable concomitance between the probans smoke and probandum fire as the observer has abundantly experienced (*bhūyodarśana*) in the past.

Thirdly there is the assurance of the existence of an uncertain object (e. g. fire) in the subject (e. g. hill) due to the rule of invariable concomitance.

In this case where Śaṅkuka discussed about inference he adopted the *āroha* method (ascension policy). According to Ācārya Śaṅkuka through the inference of the emulated *sthāyibhava* in the *naṭa* the spectator experiences or reaches to the ultimate outcome of the play- *rasa.* This is his conclusion pertaining to this argument. Now following the Nyāya-Vaiśeṣika theory of inference, the observer can explain several steps. To understand the process let take the body of inference:

1. The *naṭa* is *' mūlacaritānukaraṇarūpa-vibhāvādivan'. -(pakṣadharmatājñānam).*
2. Wherever there is '*mūlacaritānukaraṇarūpa-vibhāvādivattvam'* there is

'*mūlacaritānukaraṇarūpa-sthāyibhāvavattvam, laukika- nāyaka-nāyikāvat'* -(*vyāptijñānam, , laukika- nara-nāribat*).

3. *Naṭa* is' *'mūlacaritānukaraṇarūpa-sthāyibhāva -vyāpya- mūlacaritānukaraṇarūpa-vibhāvādivān.*' (*parāmarśajñānam*).

4. Therefore *naṭa* is *'mūlacaritānukaraṇarūpa-sthāyibhāvavān.'(anumiti).*

In the above mentioned example, some points are to be noted. Here is the perception of a mark or reason which may called as probans or *hetu*, (e.g. *'mūlacaritānukaraṇarūpa-vibhāvāditrayasaṃyoga -vattvam'* which means the triangular connection of *vibhāva, anubhāva, sancāribhāva or vyabhicāribhāva* which can be stated as *mūlacaritānukaraṇarūpa-vibhāvānubhāva-vyabhicāribhāva -saṃyoga*) in a subject or *pakṣa* i.e *naṭaḥ*.

Secondly, here is a recollection of *'mūlacaritānukaraṇarūpa-vibhāvāditrayasaṃyoga* and *'mūlacaritānukaraṇarūpa-sthāyibhāva*' as aesthetes have abundantly experience outside the world *(bhūyodarśana*)in the past.

Thirdly, here is the assurance of the existence of an uncertain object (e. g.

'mūlacaritānukaraṇarūpa-sthāyibhāva) in the subject (e. g. *naṭaḥ*).

So the conditions regarding this process are the perception, recollection or remembrance and assurance. The perception is followed by the remembrance and again the remembrance is followed by the assured knowledge.

Here may arise one doubt. Though the spectators are taking the trio of imitated *vibhāvāditraya* as real *hetu* (cause) but practically it belongs to the real dramatic character. Here it can be doubted that the inferences drawn from the artificial *hetu* might lead to incorrect knowledge. So it may be treated somewhere as unreal cognizance. In that case the validity of *rasa* comes under doubt which might affect the whole interpretation. To solve this problem here Śaṅkuka has argued that even if there are fallacies in knowledge, if it does not contradict the reality then it cannot be negated or rejected by anyone. Thus as per material results are concerned even if there are fallacies they can be

considered evidence in support of the argument.

Śaṅkuka narrated that though the knowledge may be unreal in terms of theory but if it gives the expected result in practical terms then it is validated. He has used an example to establish this argument. If a crystal and an earthen oil lamp are placed at a distance from each other then light emanates from both. Two separate persons believe both the sparkling objects to be crystal and run towards them from a distance. When they come nearer their illusions are removed. In this case, one of them gets the crystal and the other returns disheartened. In this case the person who acquires the real crystal is not flawed as per the knowledge is concerned. Although both of them cognise non veridical knowledge, there is a difference regarding their real effects.

'arthakriyāpi mithyājñānādadṛṣṭā-

"maṇipradīpaprabhayormaṇibuddhyābhidhāvatoḥ /
mithyājñānāviśeṣe'pi viśeṣo'rthakriyāṃ prati"//' iti [9]

This example proves that even in the material world knowledge has necessary requirements in spite of a fallacy in its procedure of apprehension. Thus this kind of knowledge should be accepted. There may be a number of fallacies in the initial stage within the paradigm of theatre. The *vibhāvas* which are present in the dramatic characters are unreal and thus the inference driven from this might not lead to veridical knowledge. In spite of that this type of knowledge leads to pleasure in the minds of the connoisseur. Thus it cannot be perceived to be false or flawed.

Conclusion

In some cases reality happens over validity. In the case of drama though the cognizance is not very true at the primary stage as per the *vibhāvas* are not real but by those artificial *hetus* the result of inference comes that gives an unusual happiness cherished by the spectators. As the result comes as expected then the knowledge is neither invalid nor unreal. It is not also the barrier of manifestation of aesthetic pleasure so it is not invalid. The spectators come to the hall to cherish the *rasa*, to experience aesthetic pleasure. It is the prior need of drama. The inference comes to fulfil that need. With the help of the inference the spectators infer the *sthāyibhāva* in the *naṭa*. The knowledge of *sthāyibhāva* can be called *rasa* when it is cherished. So in this context the inference based on the imitation or emulation is validated as it leads to a valid conclusion. Though the *hetus* of this inference are imitated by them the spectator can infer the permanent mood which actually belongs to the original dramatic persona. It may not be the real *sthāyibhāva* but it is hitting the truth. It may not fulfil all the conditions of perfect syllogism but it can fulfil the aim of the inference. The *hetus* here have some functional power to lead to the necessity of drama which is the enjoyment of *rasa*.

Bibliography

[1] M.H. Abrams and G.G. Harpham, *A Glossary of Literary Terms*. Delhi: Cenage Learning, (2017).

[2] V. Shastri Abhayankar, (ed.), *Nyāyakośa or dictionary of teaching terms of Indian Philosophy by Bhīmācārya Jhalkikar*, Poona: BORI, (1928).

[3] N. Bharata, P. Kumar (ed.), Delhi; New Bharatiya Book Corporation, (2006).

[4] G.T. Deshpande, *Indian Poetics*. New Delhi: Popular Prakashan Pvt. Ltd., (2009).

[5] S. K. De, History of Sanskrit Poetics, Calcutta : Firma K.L Mukhopadhyay, (1960).

[6] G. N. Devy, Indian Literary Criticism. New Delhi: Orient Black Swan, (2012).

[7] H. Dixit, Rasa-vimarśaḥ, Kanpur: Sarada Press, (1999).

[8] P. Dwibedi, (ed.). *Nāṭyaśāśtram* (with Commentary of Abhinavagupta's *Abhinavabhāratī*), Varanasi: Sampurananda Sanskrit University, **Vol-I,** (2001).

[9] R. Gnoli, *The Aesthetic Experience According to Abhinavagupta,* Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Studies, **Vol. LXII**, (1956).

[10] A. B. Keith: *A History of Sanskrit Literature.* London: Oxford University Press, 1885 -1928.

[11] R. Nagar, (ed.). *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni* (with the Commentary *Abhinavabhāratī* by Abhinavagupta's), Delhi-Ahmedabad: Parimal Publications, **Vol-I**, (1981).

[12] M. Shastri, (ed.). *Nāṭyaśāstra of Bharatamuni* (with the comm. *Abhinavabhāratī of Abhinavagupta*). Varanasi: Banaras Hindu University, (1971).

[13] V. N. Jha, *Indian Aesthetics and Poetics*. Delhi: Indian Book Centre, (2003).

End Notes

[1]P. V. Kane, History of Sanskrit Poetics. Delhi: Motilal Banarasidas, p.44, (2015).

[2]R. Nagar, (ed.) Nāṭyaśāstra of Bharatamuni (with the Commentary Abhinavabhāratī by Abhinavagupta's), Delhi-Ahmedabad: Parimal Publications, **Vol-I,** p. 271, (1981)

[3] *Ibid ,* p.272.

[4] *Ibid* ,pp. 271-2.

[5] Y.V. Athalye, *Tarkasaṁgrahaḥ of Annaṁbhaṭṭa.* Bombay Sanskrit Series. Bombay, The Dept. of Public Instructions, p.34, (1930).

[6] *Ibid* ,p.25.

[7] G. Bhattacharya,. (ed.). *Tarkasaṁgraha-Dīpikā: Annaṃbhaṭṭa* (with Eng. Trans and notes). Calcutta: Progressive Publishers, p. 156, (1983)

[8] G. Bhattacharya, *.op.cit.,*p. 238.

[9]*Ibid ,* p.272.

Contents

1. প্রত্নসাক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুকাল্ট এবং জনপদের সংস্কৃতি

কিশলয় জানা.....01 – 21

2. উত্তরবঙ্গের লৌকিক জীবনে শিবের রূপবৈচিত্র্য

অদ্রিজা চৌধুরী.....22 – 28

3. Memory, History and the land in Transition:A post - Colonial Perspective in Salman Rushdie's "Midnight's Children"

Ambarish Sen .....29 – 33

4. An assessment of socioeconomic vulnerability in a few selected villages in Sundarban, India by Artificial Neural Network.

Semanti Das and ChandanSurabhi Das.....34 – 43

5. উনিশ শতকের বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার অবসরযাপন

ঊর্মিতা রায়.....44 – 49

6. "WORLDMAKING" : THE LEGACY OF NELSON GOODMAN.

Madhuchhanda Bhattacharyya .....50 – 58

7. সমন্বয়ের সাধনায় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়.....59 – 62

8. The Influence of Nyāya-Vaiśeṣika Philosophy on the Interpretation of Śaṅkuka

Poulomi Saha ..... 63 - 70

AUREOLE

ISSN 0976-9625

An Academic Journal

Guidelines to Authors for Humanities, Social Sciences and Science Subjects

Guidelines to Authors for Science Subjects AUREOLE –An Academic Journal (ISSN 0976 –9625) is a well intended endeavour of the Barasat Government College to facilitate publication of papers/articles in the do main of Humanities, Science and Social Science.

- Full-length papers should be limited to 10 printed pages.
- The **title zone** of the manuscript should be the upper-half portion of the first page and should include the title, names and addresses of the authors, abstract and keywords.
- The **abstract** should clearly state the rationale, objectives, methods, views and important conclusions of the study. It should not exceed 180 words (10 pt in MSWord).
- The abstract should be followed by not more than five **keywords** indicating the contents of the paper and useful for abstracting purposes (10 pt in MSWord).
- The **main text** of the paper should start from 3 lines below the Keywords in the first page. The paper should be organized in different sub-sections. Sub-section headings are to be typed in bold running text and flushed with the left-margin. The following scheme of organization of the paper in different sub-section may be considered to be adhered to: Introduction, Specific Problem to study and Methodology, New Insights or Views, Results, Discussion, Acknowledgements, References. Wherever appropriate, results and discussion can be combined and Acknowledgements be omitted (12 pt in MSWord).
- **Introduction** should be brief and limited to the statement of the problem and aim of the study.
- **Specific Problem to Study** should be clearly spelled out and **Methodology** applied to study the same should be clearly stated. For well-known methods, citation of reference will suffice.
- **New Insights and Views** which are relevant and are specifically applied to resolve the problem under study are to be clearly mentioned.
- **Results and Discussion** should be clear to readers in different disciplines . Regarding the units of any measurement, authors are to stick to SI system.
- **Tables** should be included within the text at relevant place with a heading stating its contents clearly and concisely. Numericaldata and calculations should be thoroughly checked.
- **Figures** should be included within the main text of the paper at relevant places and should be of proportional size (with the text)as well as legible. Legends to the illustrations should be typed below the figure and information in the legend should not be repeated in the text and similarly, the same data should not be represented in both graph and table form. All figures, whether photographs, maps, graphs or line drawings should be numbered consecutively.
- **Line drawings** of high quality and in the desired size would have to be included in the running text of the main body of the paper.Any inscription should be clearly legible.
- **Photographs if any**, should be of high contrast, black and white or colour and of suitable size and should be embedded within the maintext.
- **Acknowledgements** should mention only guidance or assistance received in real terms, and financial grant provided by anagency. Acknowledgements for inspiration, typing etc., need not be mentioned.
- **References** in text, to be cited by author, would have to be in numerals within square brackets as [1] etc. Multip le citations should be in multiple numbers within the square brackets as [2-7, 10, 15] where the first part indicates that references numbered 2 to 7 are all cited.

Published by :

The Principal
Barasat Government College
10, K. N. C. Road, Barasat,
Kolkata - 700124